কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ১১৪

শামসুদ্দীন নওয়াব

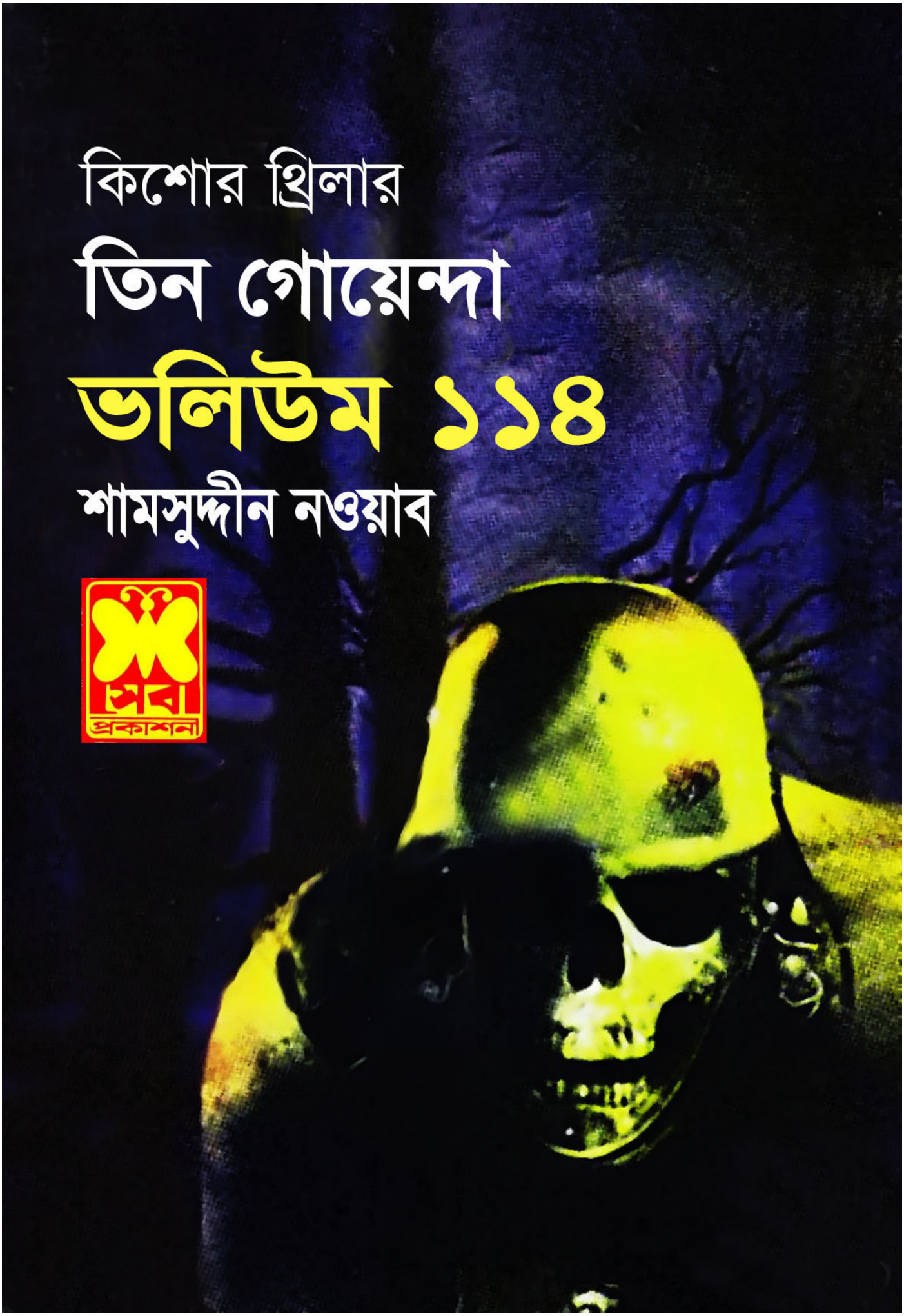

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম-১১৪

তিন গোয়েন্দা

শামসুদ্দীন নওয়াব

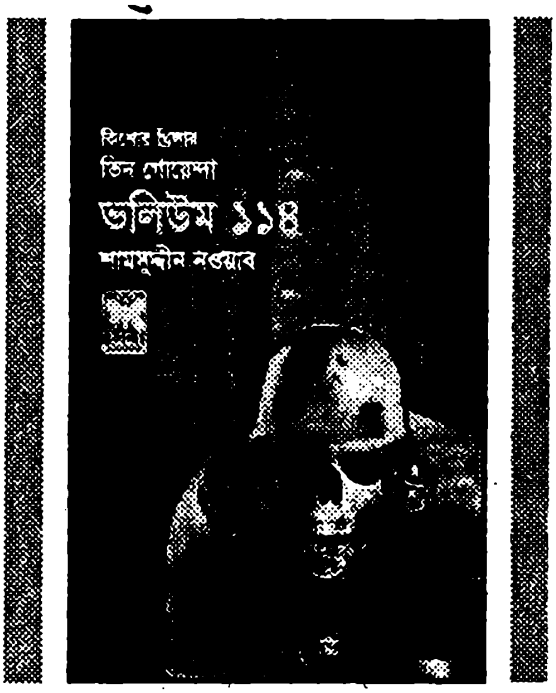

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1649-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং ইনচার্জ: বি. এম আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স- ৮৫০
e-mail sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-114
TIN GOYENDA SERIES
By: Shamsuddin Nawab

সেবা প্রকাশনী

উনপঞ্চাশ টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নামঃ
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বুদ্ধির খেলা/শামসুদ্দীন নওয়াব : ৭–১১৬
অরণ্যের প্রতিশোধ/শামসুদ্দীন নওয়াব ১১৭–১৪৯
ভুতুড়ে বিমান/শামসুদ্দীন নওয়াব : ১৫০–১৮৫

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫২/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)	
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	

তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)
তি. গো. ভ. ৬০ (উটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, উটকি শত্রু) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+উটকি গোয়েন্দা)
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর)

তি. গো. ভ. ৭৯	(লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব)	
তি. গো. ভ. ৮০	(মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)	
তি. গো. ভ. ৮১	(কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২	(বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩	(খনিতে বিপদ!+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪	(মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+উটকি রাজকুমার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৮৫	(গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+সেরা গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৮৬	(পাহাড়ে বন্দি+বারমুডা অভিযান+রহস্যের হাতছানি)	
তি. গো. ভ. ৮৭	(মমিরহস্য+ভাইরাস আতঙ্ক+তালিকা-রহস্য)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮৮	(পিছনে কে?+খুনে তান্ত্রিক+কালো আলখেল্লা)	
তি. গো. ভ. ৮৯	(বোম্বেটের সিন্দুক+মারাত্মক বিপদ+হারানো তলোয়ার)	
তি. গো. ভ. ৯০	(হিমগিরিতে সাবধান!+সাগরে শঙ্কা+খেপা জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৯১	(ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভূতুড়ে বাড়ি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯২	(জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯৩	(পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯৪	(সময়সুড়ঙ্গে আবার+হিমপিশাচের কবলে+ছায়ামানবী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯৫	(মরণসঙ্কেত+জলদস্যুর গুপ্তধন+গোলমাল)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৯৬	(সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা+দ্বীপরহস্য+দুর্গরহস্য)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৯৭	(ভেল্কিবাজ+মঙ্গলের অতিথি+প্রেতচক্র)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৯৮	(ঝড়ের দ্বীপ+জিন্দালাশের মুখোমুখি+তুষারগিরি-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৯৯	(রুদ্র সাগর+মূর্তি চোর+মহাকাশের দূত)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০০	(নিঝুমপুরের কাণ্ড+তুষারদানো+খুলিগুহার রহস্য)	
তি. গো. ভ. ১০১	(প্রেত বৈমানিক+ছায়া কালো কালো+বাতিঘরের পিশাচ)	
তি. গো. ভ. ১০২	(গুপ্তদূত+গ্রহান্তরের বন্ধু+জাদুঘরের দানব)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১০৩	(মাদক-রহস্য+গুপ্তধনের নকশা+ভয়ের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ১০৩/২	(অভিশপ্ত পাথর+দানবের চোখ+হারানো মমি)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১০৪	(নিখোঁজ মেয়ে+মৃত নগরী+বনের খাঁচায়)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০৪/২	(গোরস্থানে সাবধান!+নেকড়ের বনে+খাবারচোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০৫	(ভূতুড়ে ট্রেন+ইয়েতি-রহস্য+ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধন)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০৫/২	(লকেট-রহস্য+উটকির পেট শো+পান্না-রহস্য)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৬	(ভূতুড়ে শহর+ রোবট-রহস্য+পান্না-রহস্য)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০৬/২	(লাটসাহেব+পাজি বিড়াল+ভৌতিক দুর্গ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১০৭	(যন্ত্রপিশাচ+বিভীষণের জাগরণ+কঙ্কাল-রহস্য)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১০৭/২	(টেরোড্যাকটিলের থাবা+পাহাড়ী দানো+রাজকুমারের খোঁজে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৮	(অভিশপ্ত হোটেল+সবুজ মৃত্যু+হারকিউলিস-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৮/২	(বনভূমির আতঙ্ক+বামন ভূত+ড্রাকুলার আলখেল্লা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৯	(ওয়াণ্ডারম্যান+খুনে রোবট+নেকড়ের গর্জন)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৯/২	(আবার মায়ানেকড়ে+টি-রেক্স-রহস্য+বনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১০	(বিদায়, মুসা!+বাক্স-রহস্য+মৃত্যু-মমির অভিশাপ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১১০/২	(অদৃশ্য হাত+সার্কাসের তাঁবু+চাঁদের মানুষ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১১	(ঠগবাজ+মৃত্যুর মুখোমুখি+হারানো ক্যামেরা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১১/২	(দুঃস্বপ্নের খেলা-১+দুঃস্বপ্নের খেলা-২+ডাইনোসরের উপত্যকা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১২	(জাদুকরের ভেল্কি+মিশর-রহস্য+হিম মৃত্যুর ফাঁদে)	৬২/-
তি. গো. ভ. ১১২/২	(ছায়ামূর্তি+গ্রহান্তরের দুঃস্বপ্ন+ভূতুড়ে খামার)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১১৩	(নির্জন উপত্যকা+ভিনগ্রহে বিপদ+ডাইনীর কবলে)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১৩/২	(ফুলচোর-১ ও ২+গৃহযুদ্ধ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১১৪	(বুদ্ধির খেলা+অরণ্যের প্রতিশোধ+ভূতুড়ে বিমান)	৪৯/-

বুদ্ধির খেলা

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

সকাল। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড। ইয়ার্ডের মূল অফিসের ছাদে রঙিন টালি। ওখানে মেরি চাচীর কাঁচঘেরা চেম্বার, ছাপার মেশিনের ওপাশে জঞ্জালের স্তূপ উঁচু হয়ে থাকায় ওঅর্কশপ থেকে দেখা যায় না। তবে এখন ওয়র্কশপে নেই তিন গোয়েন্দা, আছে বাতিল মালের নীচে চাপা পড়া ওদের হেডকোয়ার্টার, মোবাইল হোমে।

আধ-পোড়া ডেস্কে বসে জটিল একটা জ্যামিতি নিয়ে মগ্ন কিশোর, মুসা ব্যস্ত মটর সাইকেলের একটা নষ্ট কারবুরেটর মেরামত করতে, আর রবিন ভ্রূ কুঁচকে উচ্চারণ করে করে পড়ছে একটা বাংলা বই।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ফোন।

বইটা নামিয়ে রেখে সবাই যাতে ওর কথা শুনতে পায় সেজন্য স্পিকারের সুইচটা অন করে রিসিভার তুলল রবিন। বইয়ের এই এক সুবিধে, যখন ইচ্ছে রেখে দিয়ে কাজ সেরে আসা যায়। নাটক-সিনেমার মতো নয় যে, গেলাম তো কাহিনী এগিয়ে যাবে, ফিরে এসে আর তাল রাখা মুশকিল।

'হ্যালো? তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার এটা।'

'হ্যালো, কে?' ওদিক থেকে প্রশ্ন করা হলো।

কোঁচকানো ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল রবিনের। বাড়ির কলিং বেল টিপে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া যদি শয়তানি হয়, তা হলে ফোন করে নিজের পরিচয় না দিয়ে কে ধরল সেটা জানতে চাওয়া বিশ্রী একটা অভদ্রতা।

'আপনি কে তা বলুন।'

'আমি শ্যারন,' অস্থির শোনাল গলাটা। 'কে, রবিন?'

শ্যারন মেয়েটা ওদেরই সমবয়সী। এই কিছুদিন আগে ওদের স্কুলে

একই ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। হাসিখুশি সহজসরল আর কৌতুকপ্রিয়। সহজেই তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওর। এমনকী জিনার সঙ্গেও খাতির হয়ে গেছে শ্যারনের। এতোটাই যে, দু'দিন আগে বাবা-মার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে যাওয়ার সময় জিনা ওর হেফাজতেই রাফিয়ানকে রেখে গেছে। বিনা পয়সায় ডগ-হাউসে রাফিয়ানকে রেখেছে শ্যারন।

'হ্যাঁ, আমি রবিন। কী ব্যাপার, শ্যারন, তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে খারাপ কিছু হয়েছে।'

খানিক নীরবতা, তারপর ফুঁপিয়ে উঠল শ্যারন। 'আমি ফেঁসে গেছি, রবিন। তোমাদের সাহায্য খুব দরকার। পুলিশ আমাকে জেরা করছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে না জানি কতো বড় অপরাধ করেছি আমি।' কথার ফাঁকে ফাঁকে ফোঁপাচ্ছে শ্যারন। 'তোমরা তো গোয়েন্দা, তোমরা হয়তো পুলিশকে বোঝাতে পারবে আসলে আমার কোনও দোষ নেই।'

বন্ধুদের দিকে তাকাল রবিন। 'কী হয়েছে, শ্যারন? কোথায় তুমি?'

ইতিমধ্যে জ্যামিতির খাতা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেছে কিশোর। মুসার হাতে এখনও কারবুরেটর ধরা, মুখটা একটু হাঁ হয়ে আছে। দু'জনেরই মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে রবিন আর শ্যারনের ফোনালাপ।

'কাজের জায়গায়।' গলা কাঁপছে শ্যারনের। 'পেট মোটেলে। কোটিপতি হার্বার্ট রকফেলারের শখের কুকুরটা চুরি হয়ে গেছে। আমার বস্ খেপে আছেন আমার ওপর। আমার ডিউটির সময়েই চুরিটা হয়েছে বলে ধারণা করছে সবাই। বস্ আভাস ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন, আমি এই কুকুর-চুরির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত।'

কোটিপতি হার্বার্ট রকফেলার ছুটি কাটাতে নিজস্ব ইয়টে করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, খবরের কাগজে পড়েছে ওরা। যাওয়ার আগে রকি বিচের নতুন পেট মোটেলে নিজের শখের কুকুরটাকে রেখে গেছেন ভদ্রলোক। নামীদামী বড়লোক যাঁরা তাঁদের অনেকেই ইদানীং বাইরে গেলে ওই পেট মোটেলে নিজেদের কুকুর রেখে যান। ওখানে ডিলাক্স রুমে কুকুর রাখতে হলে প্রচুর খরচ করতে হয়, সবার পক্ষে সেটা সম্ভব

নয়।

নীরব সমঝোতা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার ভিতর। রবিন বলল, 'চিন্তা কোরো না, শ্যারন; আমরা আসছি।'

ফোন রেখে দিল শ্যারন। রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিনও। কিশোর বলল, 'কুকুর অপহরণ করেছে কেউ। নিশ্চয়ই অনেক টাকা মুক্তিপণ দাবী করবে। শুনেছি রকফেলার সাহেবের জানের জান ওই বিরল প্রজাতির কোলিটা।'

'কুকুরটা কোলি সেটা তুমি জানলে কী করে?' ভ্রূ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

রবিন বলল, 'পেপারে পড়োনি? দুর্লভ কুকুর। কয়েকটা ফ্যাশন শোতে চ্যাম্পিয়ানও হয়েছে।'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'একটা ব্যাপার তোমরা খেয়াল করেছ? অভিজাত এলাকা থেকে একটা স্পিৎজ কুকুরও নিখোঁজ হয়েছে। কালকের পেপারে ওটার মালিক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যে ওটা ফেরত এনে দিতে পারবে তাকে তিনি পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেবেন।'

'পড়েছি,' বলল রবিন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ধারণা ওটাও কুকুর চোরের কাজ, কিশোর?'

'হতে পারে,' একটু দ্বিধা করে বলল কিশোর। 'ওটার মালিকও পয়সাওয়ালা মানুষ। কিন্তু যদি কাজটা কুকুর চোরের হয়ও, তখন পর্যন্ত কেউ মুক্তিপণ চায়নি।'

মোবাইল হোম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, মেরি চাচীকে অফিসেই পেল। তাঁকে বলে এবার ওরা চড়ে বসল মুসার তোবড়ানো ফোক্সওয়াগেনে। বিকট কয়েকটা মিস ফায়ার করে স্টার্ট নিল এঞ্জিন, রওনা হয়ে গেল ওরা।

'শ্যারন পেট মোটেলে পার্টটাইম চাকরি নিয়ে মনে করেছিল জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে সময়টা দারুণ কাটবে ওর,' বলল রবিন। 'এখন ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে। দুঃখজনক।'

ডগ-হাউস পেট মোটেলটা শহরের উত্তর প্রান্তে। শুনেছিল, তবু

ওটার সামনে পৌঁছে খানিকটা অবাক না হয়ে পারল না তিন গোয়েন্দা। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখতে একদম মানুষের হোটেলের মতোই। গেটের উপর একটা নিয়ন সাইন। তাতে লেখা: ঘর খালি আছে।

গাড়িপথটা বেঁকে চলে গেছে একটা বিরাট পোর্টিকোর নীচে। ওখানে গাড়ি থামাল মুসা। নামল ওরা। সামনের কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে অফিসের ভিতর উপস্থিত শ্যারন, চীফ ইয়ান ফ্লেচার এবং আরও কয়েকজনকে।

কাঁচের দরজা ঠেলে অফিসে ঢুকল ওরা, চলে এলো রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারের সামনে। ওখানেই শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্যারন। তিন গোয়েন্দা ঢোকার পর ফ্যাকাসে চেহারায় একটু রং ফিরে এলো ওর। ওদের দেখে হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার। 'কি, রহস্যের গন্ধ পেয়ে হাজির হয়ে গেছ? জানলে কীভাবে যে এখান থেকে রকফেলারের কুকুরটা চুরি গেছে?'

কিশোর জবাব দেওয়ার আগেই মরচে রঙা চুলওয়ালা এক প্রৌঢ় ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর চেহারায় বলে উঠলেন, 'কারা এরা?'

'ও কিশোর পাশা,' ওদের পরিচয় জানালেন পুলিশ চিফ।

কিশোর বলল, 'আমরা গোয়েন্দা। যে-কোনও রহস্য সমাধানে আগ্রহী। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি-রাহাজানি-খুন, এমনকী ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছ-পা নই।'

মনে হলো ওদের নাম আগে শোনেননি ভদ্রলোক, চোখ সরু করে চীফের দিকে তাকালেন।

'তোমরা সত্যিই তিন গোয়েন্দা?' উত্তেজিত একটা স্বর জানতে চাইল। বক্তা এইমাত্র পিছনের দরজা দিয়ে অফিসে এসে ঢুকেছে। তরুণী মেয়েটা ওদের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হবে। পরনের কাপড় কোঁচকানো, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। 'ওয়াউ, পত্রিকায় তোমাদের কথা অনেক পড়েছি।'

'ও আয়োলা মর্টন,' বলল শ্যারন। 'আয়োলা রাতে ডিউটি করে।'

ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে এসে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে একে একে হাত মেলাল তরুণী। স্মিত হেসে বলল, 'আমাকে অগোছাল দেখাচ্ছে বলে

দুঃখিত।' দু'হাতে গাউনের ভাঁজ দূর করতে চেষ্টা করল। 'মিস্টার লেবউফ যখন ডাকলেন তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে,' কড়া গলায় বললেন মোটেল-মালিক গ্রেগ লেবউফ। 'শ্যারনকে আমি বরখাস্ত করছি।'

'কিন্তু আমি চুরির ব্যাপারে কিছুই জানি না, মিস্টার লেবউফ,' ফ্যাকাসে মুখে প্রতিবাদ করল শ্যারন। 'আপনি এভাবে আমাকে অপমান করবেন না।'

'হয়তো সত্যিই জানো না,' বুকে হাত বাঁধলেন লেবউফ। 'তবে আমি আর আমার স্ত্রী এই মোটেলের মালিক। কাকে হায়ার করব আর কাকে ফায়ার করব সেটা আমাদের ইচ্ছে।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি গ্রেগ লেবউফ।'

এবার মুখ খুললেন ইয়ান ফ্লেচার। 'আমার অফিসাররা পরীক্ষা করে দেখেছে, চোর এসেছিল কেনেলের পেছন দিকের দরজা খুলে। তালাটার ওপর কারিগরী ফলানো হয়েছে। আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেছে।'

'আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কেউ যদি কোলির চোরটাকে ধরতে পারে তা হলে ওরাই পারবে,' জোর দিয়ে বলল আয়োলা। 'ওরা বিখ্যাত গোয়েন্দা।'

মৃদু হেসে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল কিশোর, তারপর আবার তাকাল চীফ আর মিস্টার লেবউফের দিকে। ইয়ান ফ্লেচার হাতের ইশারায় ওদেরকে সঙ্গে আসতে বলে পা বাড়ালেন ভিতরের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। ওদের পিছু নিল বাকিরা।

একটা দরজা পার হয়েই কেনেল। এখানে খাঁচার ভিতর সাধারণ কাস্টোমারদের কুকুর রাখা হয়। চওড়া করিডরের দু'পাশে সারি সারি দরজা। ওগুলো বড়লোক কাস্টমারদের শখের কুকুরদের বিলাশবহুল ঘর। ওগুলোর ভিতর সোফা, টেলিভিশন আর আরামদায়ক ফোমের খাটও আছে। ওগুলোর একটাতেই ছিল কোটিপতি হার্বার্ট রকফেলারের কোলি।

পরিচিত একটা ভউ-ভউ ডাক শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা। আওয়াজ লক্ষ করে তাকাতেই দেখতে পেল রাফিয়ানকে। মাঝারি

আকারের একটা খাঁচার ভিতর থেকে ঘনঘন লেজ নাড়ছে আর ছটফট করছে রাফিয়ান। মুক্তি পেলেই ছুটে আসবে, সেজন্য অস্থির হয়ে আছে। রাফিয়ানের ডাক শুনে নানা আকারের খাঁচার ভিতর থেকে ডেকে উঠল আরও কয়েকটা বিভিন্ন জাতের কুকুর। পকেট থেকে বিস্কুট বের করল মুসা, ছোট প্যাকেটটা খুলে রাফিয়ানকে দিল। আয়োলাও অন্যান্য খাঁচার কুকুরগুলোকে ডগ-বিস্কুট বিলি করছে।

করিডরের শেষ মাথায় থামলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, স্টিলের তৈরি দরজাটা দেখালেন কিশোর, মুসা আর রবিনকে। 'এখান দিয়েই চোরটা ঢুকেছিল।' এবার হাত নেড়ে বিদায় চাইলেন তিনি, মিস্টার লেবউফকে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, তদন্ত করব আমরা। দেখা যাক চোরটাকে ধরতে পারি কি না।' স্টিলের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। একটু পরই তাঁর গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

দরজার ওপাশে চলে গেছে কিশোরও, পকেট থেকে ছোট্ট একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে তালাটা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল। চাবি ঢোকানোর ফুটোর আশেপাশে আঁচড়ের দাগ ওর চোখ এড়াল না। এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। রাস্তা দেখা যায় এখান থেকে। সহজেই এখানে আসতে পারবে চোর, ছোট দরজাটা তালা-বন্ধ থাকলে শুধু তিনফুট উঁচু একটা দেয়াল টপকাতে হবে তাকে।

'কী বুঝলে?' দরজার কাছ থেকে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন গ্রেগ লেবউফ।

শ্যারনের অপমানটা এখনও ভুলতে পারেনি কিশোর, নিরাসক্ত গলায় বলল, 'চীফ ফ্লেচার যেমন বলেছেন, দেখে মনে হচ্ছে দরজাটা জোর করে খোলা হয়েছে।' ভদ্রলোকের দিকে তাকাল ও। 'কোন্ ঘরে কোলিটা ছিল?'

দরজা থেকে ডানদিকের প্রথম ঘরটা দেখালেন লেবউফ। 'দরজার তালা বন্ধ থাকে না। তাতে খাবার দিতে আর দেখাশোনা করতে সুবিধে। একবার বাইরের স্টিলের দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢোকার পর সহজেই ওটার কাছে যেতে পেরেছে চোর।'

'খাবার দিতে গিয়েই আমি টের পাই কোলিটা নেই,' বলল শ্যারন।

'প্রথমে এসেই অফিসের কাজগুলো সেরেছিলাম আমি, তারপর আসি খাওয়া দিতে।'

'অফিসের কাজ সারতে কতোক্ষণ লাগে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। ওর হাতে নোটবুক আর কলম।

'একঘণ্টা মতো,' জবাব দিল শ্যারন। 'তারপর যখন দেখলাম কোলিটা নেই, তখনই বুঝলাম কোথাও কোনও মস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। হার্বার্ট রকফেলার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, কাজেই ওটাকে আর কারও নিয়ে যাবার কথা নয়। এমনিতে কাউকে কোলিটা ছুঁতেও দেন না তিনি। খারাপ কিছু ঘটেছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার লেবউফকে ফোন করি আমি।'

'আর আমি ফোন করি পুলিশে,' বললেন লেবউফ।

'সকাল সাতটা থেকে তোমার ডিউটি, ঠিক?' শ্যারনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। আমি সাতটার সময় এসে আয়োলার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিই।'

আয়োলার দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনি যখন শ্যারনকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঘুমাতে গেলেন, তখন কোলিটা ছিল?'

'সত্যি বলতে কী, আমি খেয়াল করিনি,' জানাল আয়োলা। 'কিন্তু সারারাত ডিউটি করেছি, কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনিনি। জোর দিয়েই বলতে পারি, আমার ডিউটির সময় কিছু ঘটেনি।'

'ডগ-হাউস শুরুর সময় থেকেই আমাদের সঙ্গে আছে আয়োলা,' আয়োলার পক্ষ টেনে বললেন লেবউফ। 'ও যদি বলে অস্বাভাবিক কোনও শব্দ শোনেনি, তা হলে সেটাই ঠিক। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি আমরা।'

'আরও কেউ চাকরি করে এখানে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না,' জানালেন লেবউফ। 'আমি আর স্ত্রী লরা ছুটির দিনগুলোতে কাজ চালিয়ে নিই। ব্যবসাটা আরও বড় করতে টাকা জমাচ্ছি আমরা, হলিউডের ডগ-হাউস ন্যাশনাল মোটেলটা কিনতে চাই। ফাস্ট ফুডের পর এতো ভাল ব্যবসা আর হয় না।'

করিডরের খালি খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। লেবউফ ওর চাহনি লক্ষ করেছেন। বললেন, 'ব্যবসা এখনও ততোটা জমে ওঠেনি। কিন্তু শীঘ্রি অবস্থা ফিরবে। সেজন্যেই আমি চাই না ডগ মোটেল নিয়ে বাজে প্রচারণা হোক। অথচ খবরের কাগজওয়ালারা এখন আমার পেছনে উঠে পড়ে লাগবে। রকফেলার কোটিপতি, তাঁর ব্যাপারে খবর ছাপতে সাংবাদিকরা এক পায়ে খাড়া।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল আয়োলা, ফিরে গেল মুসার প্রশ্নে। বলল, 'আমি যখন এখানে প্রথম কাজে যোগ দিলাম, তখন আরও দু'জন কর্মচারী ছিল। তাদের একজন অ্যানিমেল টেকনিশিয়ান। অন্যজন এক মহিলা। নাম জেসিকা স্প্রিংগার। দু'জনের কেউ এখন আর এখানে চাকরি করে না।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক,' বললেন লেবউফ। 'নিক মিলহিজার নাম ছিল ওই ছোকরা টেকনিশিয়ানের। কুকুরের স্বাস্থ্য দেখভাল করতে তাকে চাকরিতে নিয়েছিলাম আমরা। পশুর ডাক্তার রাখলে যে খরচ হতো তার চেয়ে অনেক কম টাকাতে তাকে চাকরিতে নিই। ডাক্তারের বদলে তাকে দিয়েও আমাদের কাজ চলে যাচ্ছিল। নিক মিলহিজার আর জেসিকা স্প্রিংগারের বদলে এখনও কাউকে চাকরিতে নিইনি আমরা।'

'নিক মিলহিজার চাকরি করল না কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। রবিন নোটবুকে তথ্যটা টুকে নেওয়ার জন্য কলম বাগিয়ে ধরল।

'ওকে বরখাস্ত করেছি,' বললেন লেবউফ। 'কুকুরের গু পরিষ্কার করতে রাজি হয়নি সে। বলেছিল ওটা অ্যানিমেল টেকনিশিয়ানের কাজ নয়।'

'আমি মিলহিজারকে চিনি,' তথ্য জোগাল আয়োলা, 'সে কুকুরচুরির সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত থাকার মতো মানুষ নয়।'

নোটবুকে তথ্যটা টুকে নিল রবিন। মুসা ঢুকে গেছে কোলির ঘরে। কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখছে।

'আর জেসিকা স্প্রিংগার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দিনের ডিউটি ছিল তার,' জানাল আয়োলা।

'ভাল চাকরি পেয়ে চলে গেছে জেসিকা,' বললেন লেবউফ। 'নতুন

পেটফুড সুপারস্টোরে কাজ নিয়েছে সে।'

'এমন কারও কথা আপনি মনে করতে পারেন যে আপনার ওপর খেপে আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কারিনা মুর,' এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বললেন লেবউফ। 'পত্রিকায় যেদিন ডগ মোটেল চালু হবার কথা শুনল সেদিন থেকেই আমার পেছনে লেগেছে সে।'

'পাশের বাড়িতেই থাকেন উনি,' জানাল আয়োলা মর্টন।

'বিড়াল পোষে কারিনা মুর,' বললেন লেবউফ। 'অন্তত শতখানেক বিড়াল আছে তার বাসায়। কুকুর অসম্ভব ঘৃণা করে মহিলা। কোর্টে পিটিশনও করেছিল, যাতে আমি ডগ-হাউস চালু করতে না পারি। জুরির সিদ্ধান্তে যখন আমি জিতলাম, আরও খেপে গেল সে। বাড়িটা বানানোর সময় পিকেটিংও করেছে। পত্রপত্রিকায় কড়া কড়া সব চিঠি দিয়েছে। সেগুলো ছাপাও হয়েছে। গত সপ্তাহে তার একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। তাতে সে অভিযোগ করেছে, পুরো এলাকায় কুকুরের গায়ের দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।'

'আমি তো কোনও গন্ধ পাচ্ছি না,' বলল মুসা। কোলির ঘর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে ও।

সবকিছু ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার, খেয়াল করল কিশোর।

'হুমকি দিয়ে কিছু ফোন আসছে ইদানীং,' বলল আয়োলা। 'আমি নিজের পরিচয় দিলেই রেখে দেয়। চাপা গলায় কথা বলে, পুরুষ না মেয়ে বোঝা যায় না। ঠিক জানি না, তবে সে কারিনা মুরও হতে পারে।'

'কোলিটা চুরির সঙ্গে এইসব ফোনকলের যোগাযোগ আছে মনে করছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানি না,' বলল আয়োলা।

'পাওয়া যাবে কোলিটাকে?' উদ্‌গ্রীব দেখাল শ্যারনকে।

'তদন্ত করব আমরা,' আশ্বাস দিল মুসা।

রবিন বলল, 'সাধ্যমতো সবকিছুই করব।'

'তার মানে তোমরা তদন্ত করছ?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন গ্রেগ লেবউফ।

'শ্যারন আমাদের বান্ধবী,' বলল কিশোর। 'ওর জন্যে এটুকু করা আমাদের কর্তব্য।'

'একমাস ধরে শ্যারনের সঙ্গে কাজ করছি, অথচ একবারও ও বলেনি ও বিখ্যাত তিন গোয়েন্দার বন্ধু,' বলল আয়োলা।

'এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করলে কোলিটা ফেরত আসবে না,' রুক্ষ স্বরে বললেন লেবউফ। 'কাজ আছে আমার, আমার সঙ্গে আর কোনও কথা না থাকলে আমি চললাম।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। ওরা নীরব দেখে গটগট করে হেঁটে রিসেপশন অফিসের দিকে ফিরে চললেন।

আয়োলা বলল, 'আমাকেও আপাতত যেতে হচ্ছে। বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে বাবা-মাকে জানাতে হবে আমি কোথায় আছি। বাড়তি ডিউটি করতে হবে আমাকে। ফিরতে দেরি হবে।' নিজের অফিসে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সে।

তিন গোয়েন্দা আর শ্যারন ফিরে এলো রিসেপশন অফিসে। ভিতরে ঢুকেই কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার লেবউফ, আগের কর্মচারীদের কারও কাছে মোটেলের চাবি রয়ে গেছে?'

'না, ফিরিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমন শ্যারন এখন দেবে।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি গম্ভীর চেহারায়।

পার্স খুলে নিজের চাবির রিং থেকে ডগ-হাউসের চাবিটা আলাদা করল শ্যারন ফ্যাকাসে চেহারায়, তারপর ওটা দিয়ে দিল মিস্টার লেবউফকে।

'আমি চাই না মানুষ মনে করুক দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মচারী রাখি আমি,' নির্দয়ের মতো বললেন লেবউফ।

শ্যারন প্রতিবাদ করল, 'আমার ডিউটির সময় আবিষ্কার হয়েছে কুকুরটা নেই, কিন্তু ওটা কখন চুরি গেছে সেটা কেউ জানে না।'

'এমন কোনও প্রমাণ নেই যে চুরির সঙ্গে শ্যারন কোনও ভাবে জড়িত,' বলল কিশোর।

'কিন্তু ওকে বরখাস্ত করার মতো যথেষ্ট কারণ ঘটেছে বলে আমি মনে করি,' কড়া চোখে কিশোরকে দেখলেন লেবউফ। শ্যারনের দিকে

তাকালেন। '...আর নিয়মিত ভাড়া দেয়ার সাধ্য না থাকলে যাওয়ার আগে তোমার নেড়ি কুত্তাটাকেও নিয়ে যেয়ো।'

রাফিয়ানের কথা বলা হচ্ছে!

মুসার কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গেল। রবিন খুকখুক করে কাশল। কিশোরের চেহারা মারাত্মক গম্ভীর।

অসহায় দেখাল শ্যারনকে। মুখটা রক্তশূন্য। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল শ্যারন। 'তা হলে এখন কী হবে? রাফিয়ানকে কোথায় রাখব? আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে কুকুর রাখার নিয়ম নেই।'

'কোনও চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'ও আমার কাছে থাকবে। আমার বাঘার সঙ্গে ভাল খাতির ওর। দু'জন মিলে খেলা করে সুন্দর সময় কাটাতে পারবে। নিয়ে এসো ওকে। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।'

মনে হলো কিশোরের কথায় ভরসা পেল শ্যারন, রিসেপশন থেকে বেরিয়ে কেনেলের দিকে গেল ও। মোটেলের সামনের পোর্টিকোতে গাড়ির পাশে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

একটু পরই ফিরল শ্যারন, এক হাতে বাদামী রঙের রাফিয়ানের শেকল ধরে রেখেছে। বন্ধুদের সামনে এসে দাঁড়াল, মুখে ম্লান হাসি। শেকলটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এই যে নাও। খুব খারাপ লাগছে আমার। ঈশ্বর জানেন জিনা কী মনে করবে।'

শেকলটা নিল কিশোর। মুসা বলল, 'কিচ্ছু মনে করবে না ও। কী ঘটেছে শুনলে বরং এভাবে তোমাকে অপমান করেছে বলে রেগে যাবে মিস্টার লেবউফের ওপর।'

ভউ! ভউ!

কিশোরের গাল চেটে দেওয়ার চেষ্টা করল রাফিয়ান, লম্বা লেজটা ঘনঘন নাড়ছে আনন্দে। কিশোর চট করে মুখটা সরিয়ে নেওয়ায় বিন্দুমাত্র দেরি না করে ঘুরেই রবিনের গাল চেটে দিল।

রিসেপশনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার লেবউফ। নিষ্ঠুরভাবে বললেন, 'চোরের রুচি আছে, এটাকে নিয়ে যায়নি।'

'ও মাংগ্রল হতে পারে, কিন্তু ও খুব ভাল মানুষ,' কড়া গলায় বলল

শ্যারন। 'রাফিয়ান ওই আদুরে কোলির চেয়ে অনেক কাজের।'

ভউ! হুফ্! হ্যাহ্, হ্যাহ্!

শ্যারনের হাত চাটার ফাঁকে যেন সায় দিল রাফিয়ান।

পার্স খুলে একটা কাগজ বের করল শ্যারন, ওটা গোল করে মুড়িয়ে বলল, 'রাফি, ধর্!'

সঙ্গে সঙ্গে আলতো করে ওটা শ্যারনের হাত থেকে নিয়ে নিল রাফিয়ান। এবার শ্যারন নির্দেশ দিল, 'দিয়ে দে ওটা।'

মুখ আলগা করে মোড়ানো কাগজটা শ্যারনের দিকে বাড়িয়ে ধরল রাফিয়ান।

'লক্ষ্মী ছেলে।' পার্স থেকে বিস্কুট বের করে ওকে দিল শ্যারন। মিস্টার লেবউফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসতে বললে বসে ও, গড়াগড়ি খেতে বললে তা-ও পারে, কাউকে দেখিয়ে ছুঃ বললে তার দিকে ছুটে যায় ঘেউঘেউ করতে করতে। কিন্তু কখনও কামড়ায় না ও। বললে হ্যান্ডশেকও করে। পারবে মিস্টার রকফেলারের কোলি এতোকিছু করতে?'

জবাব দিলেন না মিস্টার লেবউফ, শুধু মুখ বাঁকালেন।

গাড়িতে করে শ্যারনকে ওদের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে নামিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা, তারপর রাফিয়ানকে নিয়ে ফিরে চলল স্যালভিজ ইয়ার্ডের উদ্দেশে। ইতিমধ্যে নিজেদের ভিতর আলোচনা করে ঠিক করে ফেলেছে, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে জানাবে ওদের সন্দেহের কথা। কেউ বা কোনও দল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কুকুর চুরি করছে।

ইয়ার্ডের ভিতর গাড়ি ঢুকিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা, রাফিয়ানকে ছেড়ে দিল উঠানে। বাঘার গায়ের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঘার সঙ্গে খেলা করতে ছুটল রাফিয়ান।

'চলো কিছু পেটে দেয়া যাক,' বলল মুসা। 'মনে হচ্ছে জীবনে কোনদিন খাইনি কিছু।'

বাড়ির ভিতর ঢুকল ওরা। সোজা কিচেনে চলে এলো। জানালার পাশেই ফ্রিজ, ওটার দরজা খুলল মুসা, টার্কির রোস্ট আর পাউরুটি বের করে মাইক্রোওয়েভ আভেনে ভরল। হাসি-হাসি চেহারায় কিছু বলতে

যাচ্ছিল, কিন্তু কিশোর আর রবিনের চেহারা দেখে থমকে গেল।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে আছে কিশোর-রবিন। ঝট করে ঘুরল মুসা ওরা কী দেখছে বোঝার জন্য। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।

রবিন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে উঠল, 'নিয়ে গেল!'

হ্যাঁ, নিয়েই যাচ্ছে বটে! দু'হাতে রাফিয়ানকে জাপ্টে ধরে তুলে নিয়ে ছুটছে এক হালকা-পাতলা লোক। রাবারের মুখোশ পরে আছে সে, চেহারা দেখার উপায় নেই। এক পলকে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা ইয়ার্ডের দরজা দিয়ে।

'চলো!' তাগাদা দিল কিশোর। জানালা টপকে নীচে নেমেই ছুটতে শুরু করল ও। পলকের জন্য ভাবল, বাঘা কেন পিছু নিচ্ছে না। কিশোরের পিছনে দৌড় দিল রবিন আর মুসা। তিনজনই প্রাণপণে ছুটছে।

ইয়ার্ডের গেট পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। একরাশ ধুলো উড়িয়ে রওনা হয়ে গেছে পুরোনো একটা ধূসর গাড়ি। ওটার একটা দরজা হলদে রং করা। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা! রাফিয়ানের ভউ-ভউ অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে!

দুই

এক দৌড়ে মুসার ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরে এলো ওরা, দেরি না করে লাফ দিয়ে চড়ে বসল। ছুটল ওরা কুকুর-চোরের পিছনে। বড় রাস্তায় উঠে ধূসর গাড়িটার মতোই বামদিকের বাঁক ঘুরল মুসা। স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে বসেছে ও। সহজে কুকুর-চোরকে হারাতে চায় না বলে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

'ওই যে!' দূরে ধূসর গাড়িটা দেখতে পেয়ে বলে উঠল রবিন। 'আবার বাঁক নিচ্ছে!'

আধ মিনিট পর বাঁক নিল মুসাও। ধূসর গাড়িটা ওদের কয়েকশো গজ সামনে। হলুদ দরজাটা বেমানান লাগছে এতোটা দূর থেকেও। 'দরজাটা বোধহয় কোনও জাঙ্ক ইয়ার্ড থেকে সংগ্রহ করেছে,' মন্তব্য করল মুসা।

'গাড়ি যেমনই হোক, ওটায় বিল্ট-ইন কার-ফোন আছে,' বলল কিশোর। গাড়ির পিছনের অ্যান্টেনাটা দেখা যাচ্ছে। 'হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে লোকটা।'

'অ্যান্টেনাটা দেখতে পাচ্ছি,' বলল মুসা। একটা ধীরগতির ডেলিভারি ট্রাক পাশ কাটাল ও।

ধূসর গাড়িটা ঢালু রাস্তার একটা অংশ পেরিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের দিকে চলেছে।

'দূরত্ব কমছে,' জানাল মুসা।

একেবারের বামদিকের লেনে সরে গেল ধূসর গাড়ির কুকুরচোরা ড্রাইভার। দুপুর এখন। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড়। তবুও তাকে হারাল না মুসা। ধূসর গাড়ি থেকে আর দুটো গাড়ি পিছনে আছে ওরা এখন।

চাকার তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে হঠাৎ ডানদিকে সরে গেল ধূসর গাড়ি।

'সামনের ওই রাস্তা পার হওয়ার আইল্যান্ড-ছাড়া জায়গাটার দিকে যাচ্ছে,' ফোক্সওয়াগেনের এঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে বলল মুসা। দক্ষ হাতে গাড়ি চালিয়ে অনুসরণ করল ও ধূসর গাড়িটাকে।

লাইমস্টোন স্ট্রিটে পড়ল এবার ওরা। দু'পাশে বন্ধ ওয়্যারহাউস আর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর। বন্দরের দিকে চলেছে ওরা। জায়গাটা বিশেষ সুবিধার নয়। চুরি-ডাকাতির জন্য কুখ্যাত।

গাড়ির গতি কমাল মুসা। 'লোকটা দু'ব্লক সামনে ডানদিকে মোড় নিয়েছে।'

একটু পরই মোড়টা ঘুরল ওরাও।

একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের খোলা দরজা দিয়ে ধূসর গাড়িটাকে ঢুকে যেতে দেখল তিন গোয়েন্দা। আর ঠিক তখনই খকখক করে কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ফোক্সওয়াগেনের এঞ্জিন।

'যাহ্!' হতাশ গলায় বলল মুসা, 'আবার প্লাগে ময়লা চলে এসেছে।'

'তুমি প্লাগ পরিষ্কার করে এসো, আমরা লোকটার পেছনে যাচ্ছি।' গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল কিশোর। রবিন আর ও এগোল ওয়্যারহাউসটার দিকে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ নেই ওয়্যারহাউসে,' কাছাকাছি পৌঁছে মন্তব্য করল রবিন।

'গোটা এলাকাই পরিত্যক্ত,' সায় দিল কিশোর। ওদের পাশ কাটাল ময়লা কাপড় পরা এক লোক, সব্জিভরা ঠেলাগাড়ি নিয়ে বাজারে চলেছে।

ওয়্যারহাউসের ফটকটা বিশাল। দরজাটা টেনে নামিয়ে বন্ধ করা হতো। এখন উপরে তুলে রাখা হয়েছে। খোলা দরজাটাকে হাঁ করা দৈত্যের কালো মুখ-গহ্বরের মতো লাগল।

'নিশ্চয়ই ভেতরে আছে লোকটা,' বলল রবিন। 'আমাদের যাওয়া কি ঠিক হবে? হয়তো অন্ধকারে আমাদের ধরার জন্যেই খাপ পেতে বসে আছে।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল কিশোর। 'আগে চলো বাইরে থেকে একবার ঘুরে দেখি জানালা দিয়ে কিছু দেখা যায় কি না, তারপর ঢুকব।'

দরজার এক ফুট দূরে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল কিশোর, তারপর সরতে শুরু করল একদিকে। রবিন একবারও দরজার দিকে না তাকিয়ে পার হয়ে গেল ওটা, তারপর কিশোরের মতোই দেয়াল ঘেঁষে অন্যদিকে চলল।

ওয়্যারহাউসের বেশিরভাগ জানালারই কাঁচ ভাঙা। একটা আস্ত জানালার উপরে *রকি বিচ স্টোরেজ* লেখা অস্পষ্ট সাইনবোর্ড দেখতে পেল রবিন।

ওদের পরিকল্পনায় কোনও লাভ হলো না। ভিতরটা অন্ধকার। বাইরে দিনের উজ্জ্বল আলো আছে বলে জানালাগুলো দিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ওরা। আবার দরজার কাছে ফিরে এলো দু'জন। বুঝতে পারছে, মুসা থাকলে আরেকটু ভরসা পাওয়া যেত।

'কোনও আওয়াজ তো পাচ্ছি না,' ফিসফিস করল রবিন।

দরজার কোনা থেকে সাবধানে উঁকি দিল কিশোর, ধুলোর মধ্যে প্রাচীন গাড়িটার চাকার দাগ দেখতে পেল। ঠোঁটে আঙুল তুলে রবিনকে সতর্ক করে ভিতরে পা বাড়াল কিশোর। রবিনও চলে এলো ওর পাশে। দু'জনই হুঁশিয়ার হয়ে আছে, যাতে আওয়াজ না হয়।

চোখ সয়ে আসতেই জানালা দিয়ে যে আলো আসছে সেই আবছায়ায় ওরা দেখতে পেল ভিতরে কেউ নেই। গাড়িটা বিরাট ঘরের কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ঘরটা লম্বায় অন্তত একশো পঞ্চাশ ফুট হবে। চওড়াতেও তার কম নয়। সিমেন্টের মেঝেতে সরু সরু আঁকাবাঁকা ফাটল ধরেছে। পুরু হয়ে ধুলো জমেছে ঘরের ভিতর। খেয়াল করতেই ওরা দেখতে পেল, ঘরটার মাঝখানে বামদিকে একটা পথ আছে। ওখান থেকে আলোর আভা আসছে।

'চাকার দাগ ওদিকেই গেছে,' বলল কিশোর।

গাড়ির চাকার ছাপগুলো নোটবুকে হুবহু এঁকে নিল রবিন, তারপর ওদিকটা লক্ষ করে এগোল দু'জন।

'সাবধানে থাকতে হবে,' নিচু স্বরে বলল রবিন। 'যথেষ্ট সময় পেয়েছে লোকটা। হয়তো ডাণ্ডা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, দুই বাড়িতে ঠাণ্ডা করে দেবে আমাদের।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল কিশোর, তারপর নীরবে ইশারা করল। কিশোর কী বলতে চায় বুঝতে অসুবিধা হলো না রবিনের, নিঃশব্দে ওয়্যারহাউসের ডানদিকের দেয়ালের পাশে সরে গেল ও। সাবধানে এগোচ্ছে আলোর আভা আসা বাঁকটার দিকে।

এদিকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। কিছু একটা শুনতে পেয়েছে ও। মনে হলো যেন আঁচড়াচ্ছে কেউ। ভ্রূ কুঁচকে উঠল কিশোরের। রাফিয়ান নাকি?

কিশোর থামতেই রবিনও থেমে দাঁড়িয়েছে। একই আওয়াজ ওর কানেও গেছে। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

মনে মনে দশ গুনল কিশোর, আর কোনও আওয়াজ শুনতে পেল

না। আঁচড়াচ্ছে না আর কেউ। নিঃশব্দে বাঁক ঘুরল কিশোর। রবিনও ওর ঠিক পিছনেই আছে।

এদিকে আরেকটা খোলা দরজা। ওটা দিয়ে আসা উজ্জ্বল আলোয় ক্ষণিকের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। সামলে নিয়ে দেখল, এদিকেও ধূসর গাড়িটার চিহ্নমাত্র নেই। রাফিয়ানকেও দেখা গেল না। ওয়্যারহাউসের এই অংশটাও ফাঁকা একটা ঘর। ওয়্যারহাউসের ধুলোভরা মেঝে আর তাতে চাকার দাগ ওদের নীরবে বলে দিল কী ঘটেছে। এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে কুকুর-চোর।

'এলাকাটা চেনে লোকটা,' বলল কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। 'এই ওয়্যারহাউসটা সম্বন্ধেও জানে।'

'জানত এভাবে হয়তো আমাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব,' বলল রবিন।

'এই ওয়্যারহাউসটা কাদের সেটা জানতে হবে।'

একটা জিনিস রবিনের চোখে পড়েছে। উবু হয়ে ওটা তুলল ও, কিশোরকে দেখাল। ইংরেজি এস-এর মতো একটা বাঁকানো হুক। জিজ্ঞেস করল, 'কী হতে পারে?'

'কুকুরের লাইসেন্স আটকানো হয় এধরনের হুক দিয়ে,' বলল কিশোর। 'আমার বাঘারও আছে এরকম একটা।' রবিনের কাছ থেকে নিয়ে জিনিসটা বুক পকেটে পুরল ও। তারপর বলল, 'আওয়াজটা শুনেছ না? ওই যে আঁচড়ানোর আওয়াজ? ওটা কোত্থেকে এলো?'

গাড়ির শব্দ শুনতে পেল ওরা। এঞ্জিনের টিক-টিক-টিক-টিক আওয়াজটা ওদের বলে দিল মুসা আসছে ওর ফোক্সওয়াগেন নিয়ে। প্লাগগুলো পরিষ্কার করে ফেলেছে। কচ্ছপের গতিতে বাঁক ঘুরল মুসা, হেডলাইটের ম্লান আলোয় ওদের দেখতে পেয়ে থামল। ও গাড়ি থেকে নামতেই কী ঘটেছে জানাল ওরা।

'আঁচড়ানোর আওয়াজটা ইঁদুরের হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মনে হয় না,' একটু ভেবে উত্তর দিল কিশোর। দরজার পাশে

একটা অফিসের দিকে হাত তুলল ও। এক সময় ওটা ম্যানেজারের অফিস ছিল। পোকায় কাটা দরজায় এখনও ম্যানআর লেখা আছে, বাকিটা ঘুণ পোকা খেয়ে ফেলেছে। 'ওখানে খুঁজে দেখা দরকার। তোমরা দেখো গাড়িটা কোন্‌দিকে গেছে আন্দাজ করতে পারো কি না।'

চাকার দাগ অনুসরণ করে এগোল মুসা আর রবিন। কিশোর চলল অফিসটার দিকে।

দরজার নবে মোচড় দিল কিশোর। তালা খোলাই আছে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল কিশোর। ঘরটায় গা ছমছমে গাঢ় অন্ধকার। জানালাগুলো পেরেক আর তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিশোর ঢুকতেই ঘড়ঘড় আওয়াজ করে উঠল একটা কুকুর।

'রাফিয়ান?' মৃদু স্বরে ডাকল কিশোর।

গর্জনটা থেমে গেল।

'রাফিয়ান?' আবার ডাকল কিশোর।

'সাবধান!' খানিকটা দূর থেকে সতর্ক করল রবিন। ফিরে এসেছে ও। 'রাফিয়ান কখনও এভাবে গর্জায় না।'

দেয়াল হাতড়ে বাতির সুইচ খুঁজল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসে নিশ্চয়ই ইলেক্ট্রিসিটির কানেকশন অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। একটা পায়া-ভাঙা চেয়ারে হোঁচট খেল কিশোর। আবার গর্জনটা শুনতে পেল। এবার অনেক কাছে! দরজা দিয়ে আসা আবছা আলোয় দেখতে পেল...

ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে ওটা। বিরাট একটা কুকুর। আলো পড়ে ওটার হলদে চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠল আবার। আতঙ্কের স্রোত টের পেল কিশোর, মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা কিছু যেন নেমে যাচ্ছে। কুকুরটা রাফিয়ান নয়!

মস্ত এক পিট বুল!

হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে সামনে বাড়ল হিংস্র জন্তুটা। পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল কিশোর, কিন্তু চেয়ারটায় আবার হোঁচট খেলো। পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে।

কুকুরটার বড় বড় ঝকঝকে দাঁতগুলো অল্প আলোয় ভয়ঙ্কর

দেখাল। একেবারে শেষ মুহূর্তে কিশোর বুঝতে পারল, ওর গলা লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠছে কুকুরটা! নাগালে পেলেই এক কামড়ে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলবে!

দু'হাতে গলা বাঁচাতে চেষ্টা করল কিশোর।

তিন

কুকুরটা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা পিছনে সরিয়ে নিল ও। ওর গলায় কামড় বসাতে পারল না পিট বুল, তবে হাতে ওটার দাঁতের স্পর্শ পেল কিশোর। যে-করে হোক ঠেকাতে হবে ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে।

পিট বুল কাছে চলে আসায় ওটার গলাতে একটা মজবুত চেইন কলার দেখতে পেল ও। জানোয়ারটা মাটিতে পা নামিয়েই আবার দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। ওটার লক্ষ্য কিশোরের কণ্ঠনালী।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে গেল কিশোর, হাত বাড়িয়ে ক্রোমের তৈরি কলারটার ঘাড়ের কাছে শক্ত করে ধরে ফেলল ও। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল পিট বুল। রাগে গর্জন করে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে কামড় বসাতে চেষ্টা করল কিশোরের হাতে।

হাত লম্বা করে কলার ধরে ওটাকে দূরে সরিয়ে রাখল কিশোর। মেঝে থেকে এক ইঞ্চি উপরে ঝুলছে কুকুরটার সামনের পা দুটো। পিছনের পায়ে যেন ব্রেকড্যান্স জুড়ে দিল।

'ছেড়ো না!' দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকল রবিন। 'শক্ত করে ধরে রাখো।' টেবিলের পাশে পড়ে আছে জঞ্জাল, তার ভিতর ইলেক্ট্রিকের একটা ছেঁড়া তার চোখে পড়েছে ওর। কুঁজো হয়ে তুলে নিল ওটা রবিন। তারটা মাত্র আড়াই ফুট লম্বা, তবে ওতেই কাজ চালাতে হবে।

প্রাণের ভয়ে শক্ত করে কলারটা ধরে আছে কিশোর। কলারের ভিতর দিয়ে তারটা ঢুকিয়ে গিঁঠ দিল রবিন। এবার দু'জন মিলে গর্জনরত কুকুরটাকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। দু'জন দু'দিকে টান

দেওয়ায় কাজটা অতোটা কঠিন হলো না। টেবিলের পায়ার সঙ্গে তারের আরেক প্রান্ত প্যাঁচ দিয়ে আটকাল রবিন। শক্ত করে গিঁঠ দিল। নীরবে সমঝোতা হয়ে গেল ওর কিশোরের সঙ্গে। এবার ঝট করে সরে এলো দু'জন পিট বুলের কাছ থেকে।

'তার খুলে না এলে বাঁচোয়া,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কিশোর।

পিট বুল ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করায় ইলেক্ট্রিকের তারটা গিটারের তারের মতো টানটান হয়ে গেছে, তবে খসে এলো না। আরও কয়েকবার লাফঝাঁপ মেরে ছুটতে পারবে না বুঝতে পারল পিট বুল। কিশোরের দিকে রক্তচক্ষু মেলে মেঝেতে বসল এবার ওটা।

'কামড় লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না,' জানাল কিশোর। এখনও হাঁফাচ্ছে। 'মিউনিসি-প্যালিটিতে ফোন করতে হবে। এটাও হয়তো চুরি যাওয়া কুকুরের একটা। ওখান থেকে কুকুর-ধরা এসে এটাকে নিয়ে যাক।'

'কে চুরি করবে এরকম একটা রাগী কুকুর?' অবিশ্বাস ঝরল রবিনের গলায়। 'করবেই বা কীভাবে? আমাকে এক লাখ ডলার দিলেও তো এটার ধারেকাছে যেতে চাইব না আমি।'

অফিসের ভিতর চোখ বুলাল কিশোর। হলদে হয়ে যাওয়া কয়েকটা কাগজ আর ক্যান্ডির খোসা ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই বলে মনে হলো ওর।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'মনে হয় না এখানে কুকুরটা বেশিক্ষণ ছিল। বোঝা যায় খাবার আর পানির অভাবে পড়েনি। অথচ এখানে ওদুটো জিনিস নেই।'

'সম্ভবত রাফিয়ানকে যে চুরি করেছে, সে-ই এটাকে এখানে রেখে গেছে,' বলল রবিন। 'আমরা ঢোকার আগে যথেষ্ট সময় পেয়েছে লোকটা।'

'আমারও মনে হয় ওই লোকই রেখে গেছে,' সায় দিল কিশোর।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। 'কী ব্যাপার? গর্জন করে কী?'

'একটা পিট বুল,' জানাল রবিন। 'আরেকটু হলেই কিশোরকে মেরে ফেলেছিল। ওর গলা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল।'

কুকুরটার আকার থেকে মুসার চোখ কপালে উঠল। 'খাইছে!'

জানালার ব্লাইন্ড তুলল কিশোর, ঘরে যাতে আলো আসে। কিশোরের কথায় ঘরটা সার্চ করতে শুরু করল ওরা। তিনজনই সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখল পিট বুলের কাছ থেকে। বসে বসে আগুনঝরা চোখে ওদের দেখছে ওটা এখন।

ময়লা ঘাঁটছে তিন গোয়েন্দা। কয়েকটা পেপার ক্লিপ আর সাপ্লাই ফর্ম ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। ভাঙা ডেস্কটা খালি।

'জরুরি কিছু নেই,' মন্তব্য করল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। 'ধূসর গাড়িওয়ালা কোন্‌দিকে গেছে আন্দাজ করতে পারলে?'

'ধুলোর মধ্যে চাকার দাগ ডানদিকে বাঁক নিয়েছে,' জানাল মুসা। 'তারপর গাড়িটা রাস্তায় উঠে যাওয়ায় আর আর কোনও চিহ্ন নেই।'

'আমরাও ডানদিকেই যাব,' বলল কিশোর। 'হয়তো তদন্তের কাজে লাগে এমন কিছু পাওয়া যেতেও পারে।'

মুসার ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরল ওরা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ বের করে তার ভিতর এস-এর মতো হুকটা রেখে দিল কিশোর। এবার মোবাইল ফোনটা বের করে মিউনিসিপ্যালিটির নাম্বারে ডায়াল করল, ঠিকানা জানিয়ে বলে দিল কোথায় পিট বুলটাকে পাওয়া যাবে।

ওকে জানানো হলো, মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে ওটাকে নিয়ে যাবে; যতোদিন মালিকের খোঁজ না পাওয়া যায়, ততোদিন সরকারী খরচে ওটার রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

হঠাৎ করেই বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল কিশোরের। বাংলাদেশে বেওয়ারিশ কুকুর ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে মিউনিসিপ্যালিটির লোকরা। ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠুর।

বন্দরের ধার দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে চলেছে মুসার ফোক্সওয়াগেন। কোথাও নেই ধূসর গাড়িটা। আধঘণ্টা খুঁজে হাল ছেড়ে দিল ওরা।

'জিনা ফিরলে কী বলবে?' স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। রিয়ারভিউ মিররে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে

ও। 'জিনা স্রেফ খুন করে ফেলবে আমাদের। শ্যারনকেই বা কী বলবে? রাফিয়ান নিখোঁজ হয়ে গেছে শুনলে কী ভাববে ও?'

'দেখি শ্যারন কী বলে,' মোবাইল ফোনটা আবার গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল কিশোর, শ্যারনদের অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে ডায়াল করল। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই, অ্যানসারিং মেশিন ক্লিকক্লিক শব্দ করে চালু হলো। কী ঘটেছে জানিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। আপন মনে বলল, 'জিনারা কোন্ হোটেলে উঠবে বলে যায়নি, কাজেই ওকে খবরটা জানানোর কোনও উপায় নেই। হয়তো ও ফিরে আসার আগেই রাফিয়ানকে আমরা উদ্ধার করতে পারব।'

বিকেল হয়ে গেছে। রোদের রং লালচে। সাগর থেকে ভেসে আসা বাতাসে লোনাজলের গন্ধ।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে কিশোরদের বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করল মুসা। নামার পর ওরা শুনতে পেল কিচেনে ফোন বাজছে। মেরি চাচী অফিসে, বাসায় কেউ নেই। ভিতরে ঢুকল ওরা, কিশোর ফোন তুলল। ডগ-হাউস থেকে রিং করেছে আয়োলা। কিশোর ধরায় দু'একটা কথার পর আফসোস করে বলল, 'খুব অন্যায় আচরণ করা হয়েছে শ্যারনের সঙ্গে। সত্যি দুঃখ লাগছে ওর জন্যে। ওর তো কোনও দোষ ছিল না।'

'আমিও তা-ই মনে করি,' বলল কিশোর। 'ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করাটা ঠিক হয়নি। তবে শক্ত মনের মেয়ে শ্যারন, আঘাতটা ঠিকই সামলে উঠবে।'

'কোলিটা খুঁজে পাবার ব্যাপারে তদন্ত এগোল?' জিজ্ঞেস করল আয়োলা।

'হাতে কিছু সূত্র এসেছে,' জানাল কিশোর।

'আশা করি তোমরা পারবে,' বলল তরুণী। 'কোলিটা চুরি হয়ে যাবার পর থেকে মিস্টার লেবউফ সবার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করছেন।'

'বুঝতে পারছি তাঁর কেমন লাগছে,' বলল কিশোর। 'কেউ একজন আমাদের এখান থেকে রাফিয়ানকেও চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'মানে শ্যারন যে-কুকুরটা তোমাদের দিল, ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'সর্বনাশ! কাজটা কার জানতে পেরেছ?'

'না, তবে জানব।'

'পুলিশে ফোন করেছ?'

'এখনও করিনি। তবে পুলিশ কোলিটাকে খুঁজছে। এখান-ওখান থেকে কুকুরচুরি হচ্ছে বুঝতে পারছি। এসব যদি একই লোকের কাজ হয়ে থাকে, তা হলে পুলিশ তাকে ধরলেই রাফিয়ানের খোঁজও পাওয়া যাবে।'

'তা ঠিক,' সায় দিল আয়োলা। '...ঠিক আছে, রাখি তা হলে। কাস্টোমার এসেছে। যদি মনে করো আমার কোনও সাহায্য তোমাদের কাজে আসবে, তা হলে যোগাযোগ করতে দ্বিধা কোরো না।'

'কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ,' বলল কিশোর। 'আগামীকাল হয়তো ডগ-হাউসে তদন্ত করতে আসতে পারি আমরা।'

বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল ও, মুসা আর রবিনকে জানাল ফোনে কী আলাপ হয়েছে, তারপর বলল, 'আজকে আর কিছু করার নেই। চলো, বাঘার খোঁজ করতে হবে। বাঘা কোথায় ছিল যখন রাফিয়ানকে নিয়ে গেল লোকটা?'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিছনের উঠানে চলে এলো ওরা। কিশোরের প্রশ্নের জবাবটা সহজেই জানা হয়ে গেল ওদের। একটা খুঁটির সঙ্গে চেইন দিয়ে বাঘাকে বেঁধে রেখে রাফিয়ানকে নিয়ে গেছে লোকটা। ওদের দেখে খুশিতে ঘনঘন লেজ নাড়াচ্ছে বাঘা। ওকে বাঁধনমুক্ত করতে করতে কিশোর বলল, 'আগামীকাল সকালে আমরা প্রথমেই যাব বিড়ালমানবী কারিনা মুরের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রমহিলা কী বলেন শোনা দরকার।'

পরদিন সকালে নাস্তার পর হাজির হয়ে গেল রবিন আর মুসা। দু'জনই উত্তেজিত। খবরের কাগজে মিস্টার রকফেলারের কুকুরটার মুক্তির জন্য এক লাখ ডলার দাবি করা হয়েছে। স্পিৎজটার জন্য পাঁচ হাজার ডলার। এক সপ্তাহের মধ্যে কুকুরগুলোর মালিকদের বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে তারা টাকা দিতে রাজি আছে কি না। রাজি না থাকলে

কুকুরের লাশ পাঠানো হবে বলে হুমকি দিয়েছে ডগন্যাপার। খবরটা কিশোরও পড়েছে। নাস্তা খেতে খেতে টুকটাক আলাপ সারল ওরা, কিশোর জানাল শ্যারন ফোন করেছিল, একেবারে ভেঙে পড়েছে রাফিয়ানের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা পেয়ে। ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে কিশোর, জোর দিয়ে বলেছে, রাফিয়ানকে ওরা উদ্ধার করবেই, যে-করে হোক।

কিশোরের নাস্তা শেষ হতেই চাচীকে বলে বেরিয়ে পড়ল তিনজন। গাড়ি চালাতে চালাতে মুসা বলল, 'কুত্তাচোরাটাকে আজকেই ধরতে পারলে ভাল হয়।'

মৃদু হাসল কিশোর। 'জিনার মুখোমুখি হবার চেয়ে কুকুর অপহরণকারীর মোকাবিলা করতে বেশি রাজি তুমি, কী বলো, মুসা?'

'অবশ্যই!' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল মুসা। 'জিনা খেপে গেলে পিট বুলের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কুকুর চোর কিছুতেই ওর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে না।'

ডগ-হাউসের দিকে চলেছে ওরা। রবিন বলল, 'মিস্টার লেবউফ যেমন বলেছিলেন, কারিনা মুর যদি তেমনি ক্ষ্যাপাটে কিসিমের মানুষ হন, তা হলে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা খুব কঠিন হবে।'

'কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে কেস পর্যন্ত করেছিলেন মহিলা,' বলল মুসা।

'সে-কারণেই কারিনা মুর আমাদের প্রধান সন্দেহভাজন,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

ডগ-হাউস পার হয়ে গেল ওরা। লক্ষ করল, এই ব্লকে কারিনা মুরের বাড়িটাই একমাত্র আবাসিক, অন্য বাড়িগুলো সব অফিস। কারিনা মুরের বাড়িটা ডগ-হাউস থেকে মাঝখানের একটা ঝোপঝাড় গজানো জমির কারণে বিচ্ছিন্ন।

ছোটখাটো দোতলা বাড়িটার সামনে গাড়ি রেখে এঞ্জিন বন্ধ করল মুসা। নেমে পড়ল ওরা গাড়ি থেকে।

বাড়ির সবগুলো জানালা বন্ধ। পিছন দিকে একটা বন্ধ গ্যারেজ দেখতে পেল ওরা। ওটার জানালার কাঁচগুলোতে রং করা হয়েছে, যাতে ভিতরে কী আছে দেখা না যায়। গোটা বাড়ি তিনফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে

ঘেরা, মাঝখানে একটা ছোট দরজা। ওটা ভিড়ানো আছে, ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা।

'মুসা, তুমি গ্যারেজটা খুঁজে দেখো,' বলল কিশোর। 'আমি আর রবিন যাচ্ছি মহিলার সঙ্গে কথা বলতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে গ্যারেজের দিকে এগোল মুসা। কিশোর-রবিন চলল বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে। দু'বার বেল বাজানোর পর ভিতর থেকে সাড়া পেল ওরা। দরজাটা সামান্য ফাঁক হলো। ডাকাত ঠেকানোর চেইন খোলা হয়নি এখনও। উঁকি দিলেন এক মহিলা। তাঁর ঘন চুলগুলো গাঢ় লাল রং করা। ভ্রূ নাচালেন ওদের দেখে।

'মিস কারিনা মুর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কে জানতে চায়?' খসখসে গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন মহিলা।

নিজের আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর, তারপর বলল, 'আমরা কারিনা মুরের কাছে এসেছি ডগ-হাউসের একটা কুকুর চুরির ব্যাপারে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে।'

'আমিই কারিনা মুর,' বললেন মহিলা। 'কুকুর চুরির ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। জানতে চাইও না।'

'আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল,' বলল কিশোর।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন কারিনা মুর, তারপর বললেন, 'তোমাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি নাছোড়বান্দা টাইপের ছেলে তোমরা, সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাকে রেহাই দেবে না। ঠিক আছে, ভেতরে এসো।' চেইন খুলে দরজাটা ফাঁক করলেন তিনি, হাতের ইশারায় ওদের ভিতরে আসতে বললেন।

সামনে থেকে দেখে ওরা বুঝতে পারল, যা ধারণা করেছিল তার চেয়ে বয়সে অনেক কম হবেন মিস মুর। ওদের কল্পনায় ছিল সাদা চুলওয়ালা বুড়ি এক মহিলা। চোখে তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি। কথায় কথায় ছ্যাঁৎ করে ওঠেন। বাস্তবে কারিনা মুর তেমন নন দেখে খানিকটা স্বস্তিই পেল কিশোর আর রবিন। মহিলার বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। একটা গেঞ্জি পরে আছেন। ওটার বুকে বড় বড় করে লেখা: *আমি বিড়াল ভালবাসি।*

[illegible] চোখ বুলিয়ে কিশোর আর রবিন বুঝতে পারল বিড়াল [illegible] কারিনা মুর। জানালার তাক আর বুকশেলফের [illegible] সারি সারি সিরামিকের বিড়াল-মূর্তি। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো [illegible] ছবিতে অন্তত একটা বিড়াল আছেই। এসব তো নিষ্প্রাণ। ঘরে শুয়ে বসে আছে জ্যান্ত বিড়ালের পাল। একসঙ্গে এতো বিড়াল কখনও দেখেনি কিশোর-রবিন। সবখানে বিড়াল হাজির। সংখ্যায় পঞ্চাশটার কম হবে না। কাউচের উপর, চেয়ারের উপর, ডাইনিং রুমের টেবিলের উপর–কোথায় নেই বিড়াল। একটু পরপর কিচেন থেকে ডাইনিংরুম আর ডাইনিংরুম থেকে কিচেনে দৌড়ে ঢুকছে বের হচ্ছে বিড়ালের দল।

'বসো,' বললেন কারিনা মুর। 'দেখো, আমার বিড়ালের ওপর বসে পোড়ো না যেন।'

'কাজটা কঠিন,' মন্তব্য করল রবিন। আস্তে করে দুটো বিড়াল নামিয়ে চেয়ার খালি করে তাতে বসল ও। ওর পাশের হ্যাসোকটা খালি আছে, ওটাতে বসল কিশোর।

একটা ইযিচেয়ারে বসেছেন কারিনা মুর।

'বিড়াল আপনি খুবই ভালবাসেন, তা-ই না?' আলাপ শুরু করার জন্য বলল কিশোর।

'ওরা প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি,' মৃদু হাসলেন কারিনা মুর।

ঘরের ভিতর চোখ বুলাল কিশোর। 'সবগুলো বিড়ালই আপনার?'

'বিড়াল কখনও কারও হয় না,' জবাব দিলেন মহিলা। 'ওরা শুধু এই বাড়িটাকে নিজেদের বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষ করে ওই জঘন্য কুকুরের মোটেলটা খোলার পর ওদের অনেকেরই আর যাবার জায়গা ছিল না।'

'ডগ-হাউস থেকে একটা কোলি কুকুর চুরি গেছে, সে-ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না।' দৃঢ় শোনাল কারিনা মুরের কণ্ঠ। 'কেব্‌ল্ নিউজ চ্যানেলে কিছু বলেনি, কাজেই জানি না। কিন্তু এতে করে যদি ওই বিচ্ছিরি ডগ-হাউসটা বন্ধ হয়ে যায় তো আমি খুশিই হবো।'

'ডগ-হাউস চালু করার আগে মিস্টার লেবউফকে আপনি চিনতেন?'

নোটবুক খুলে রেখেছে রবিন তথ্যগুলো টুকে রাখার জন্য।

'শুনেছি আপনি ডগ-হাউস যাতে চালু না হয় সেজন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন,' বলল কিশোর।

'ডগ-হাউস খুলে এলাকাটার সর্বনাশ করতে চাইছে জানার আগে লোকটার নামও শুনিনি আমি,' বললেন কারিনা মুর। 'ঠিকই বলেছ তোমরা, আমি ডগ-হাউস যাতে না হয় সেজন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ভেবো না আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। ওই কেনেল ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়ায়। তা ছাড়া, কুকুরগুলো যখন চেঁচাতে শুরু করে, তখন আমার বিড়ালগুলো ঘুমাতে পারে না। আবারও কেস লড়ব আমি। এবার জিততেও পারি।'

চট করে ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নিল কিশোর। মহা আয়েশে ঘুমাচ্ছে বেশিরভাগ বিড়াল। আর গন্ধ যা ওর নাকে আসছে সেটা কিচেনে রাখা বিড়ালের খাবারের গন্ধ।

কাছেই ম্যান্টেলের ওপর রাখা একটা ছবিতে চোখ আটকে গেল কিশোরের। ফ্রেমের ছবিতে বিড়াল নেই, শুধু মানুষের ছবি দেখে সামান্য বিস্মিতই হলো ও।

হাত দিয়ে ম্যান্টেল দেখাল ও। 'পারিবারিক ছবি?'

'হ্যাঁ। প্রায় সবাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে বলে কারও সঙ্গে দেখাই হয় না বলতে গেলে। শুধু হ্যারল্ড এখনও এখানে আছে।' ছবিতে লম্বা চুলওয়ালা একজন যুবককে দেখালেন কারিনা মুর। 'হ্যারল্ড আমার সৎ ভাই। এখানেই বন্দরে কাজ করে।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'মালবাহী জাহাজের মালামাল নামানোর কাজ?'

'না। ড্রাই-ডকে। একটা ক্রুজ শিপ মেরামত করছে ওরা এখন।'

'ডগ-হাউসের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব কেমন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঠিক আমার মতো।' হঠাৎ কড়া চোখে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন কারিনা মুর। 'অ্যাই, তোমরা নিশ্চয়ই ওই চুরির ব্যাপারে হ্যারল্ড বা আমাকে সন্দেহ করছ না?'

'প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করতে এখানে আসিনি আমরা,' শান্ত

স্বরে বলল কিশোর। 'কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। ডগ-হাউসে ইদানীং কিছু ফোনকল আসছে...'

কিশোরকে থামিয়ে দিলেন কারিনা মুর। 'আমার যদি লেবউফকে কিছু বলার থাকে, তা হলে তার মুখের ওপর বলব আমি। বুঝতে পেরেছ? যা বলার সরাসরি বলব।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'যথেষ্ট সময় দিয়েছি তোমাদের। এবার তোমরা এলে আমি খুশি হবো।'

রবিন আর কিশোর কারিনা মুরের সঙ্গে কথা বলতে বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর গ্যারেজের রং করা জানালা দিয়ে ভিতরে কী আছে দেখার চেষ্টা করল মুসা। রং যে-ই করে থাকুক, কাজে কোনও খুঁত রাখেনি। ভিতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসার মনে হলো, গ্যারেজে কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না কে জানে।

গ্যারেজের পাশে একটা দরজা দেখতে পেল ও। নব মুচড়ে ওটা খোলার চেষ্টা করে দেখল। কাজ হলো না। তালা মারা। সামান্য আওয়াজ হয়েছে। কোলি, জার্মান স্পিৎজ আর রাফিয়ান যদি ভিতরে থাকত, তা হলে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে চিৎকার জুড়ে দিত। নব ধরে আবারও শব্দ করল ও। ডাকল না কোনও কুকুর। নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজায় কান ঠেকাল মুসা।

এবার শুনতে পেল। তবে গ্যারেজের ভিতর থেকে নয়, আওয়াজটা আসছে রাস্তার দিক থেকে। আওয়াজটা চিনতে পারল ও। কোনও গাড়ির দরজা খোলার শব্দ। কিন্তু গাড়িটা আর কোনও গাড়ি নয়, ওর ফোক্সওয়াগেন! কেউ ওর গাড়ির দরজা খুলেছে!

কিশোর আর রবিন কথা সেরে গাড়ির কাছে চলে গেছে তা হলে, ভাবল মুসা। দেরি না করে গাড়ির দিকে পা বাড়াল ও।

ফোক্সওয়াগেনের ড্রাইভারের পাশে প্যাসেঞ্জারের দরজাটা খোলা। ভিতরে কে যেন নড়ছে। চেহারা দেখতে পাচ্ছে না মুসা, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল, যে-ই হোক না কেন মানুষটা, রবিন বা কিশোর নয়!

এই মাত্র বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন-কিশোর!

তা হলে গাড়ির ভিতর কে?

চার

'কিশোর-রবিন! গাড়ির ভেতরে কে যেন ঢুকেছে,' দৌড়াতে শুরু করল মুসা। থমকে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন, তারপর পিছু নিল ওর।

মুখোশ পরা লোকটা ঝুঁকে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট হাতড়ে কী যেন খুঁজছে।

গাড়ির কাছে আগে পৌঁছুল মুসা, কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করছেন আপনি আমার গাড়ির ভেতর?'

দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে ও, এদিক দিয়ে লোকটা বের হতে পারবে না।

ঝাঁকি খেয়ে সিধে হলো উলের টুপি আর রাবারের মুখোশ পরা লোকটা। ভূতের মতো লাগছে তাকে দেখতে। রাত হলে মুসা এর ধারেকাছেও যেত না, কিন্তু এখন সকালের উজ্জ্বল রোদে ভয় কীসের!

সাহায্য করতে রবিন আর কিশোরও ছুটে আসছে। এবার বাগে পাবে ওরা লোকটাকে। তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লে হালকা গড়নের লোকটা গায়ের জোরে কিছুতেই পারবে না ওদের সঙ্গে। কুকুরচুরি রহস্যের সমাধান বোধহয় হয়েই গেল। এবার বোধহয় রাফিয়ানের খোঁজও পাওয়া যাবে।

এক পলকে চিন্তাগুলো খেলে গেল মুসার মাথায়। পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে যেতে হলো ওকে। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রাখা রবিনের কয়েকটা পত্রিকা ওর মুখে সজোরে ছুঁড়ে মেরেছে লোকটা। চোখ বাঁচাতে হাত দুটো মুখের সামনে তুলল মুসা, এক পা পিছিয়ে গেল। ওর দ্বিধার সুযোগে মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভিং সিটে পিছলে সরে গেল লোকটা, তারপর ওদিকের দরজা খুলে নেমেই ঝেড়ে দৌড় দিল ফাঁকা জমির ঝোপঝাড় লক্ষ করে।

সামলে নিয়ে মুসা দেখল, ঝোপের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে মুখোশ পরা চোর। চোখের পলকে ঝোপের আড়ালে চলে গেল লোকটা। দৌড়ে কয়েক পা গিয়েই থেমে দাঁড়াল মুসা। একটা গাড়ির এঞ্জিন গর্জে উঠেছে। দ্রুত ছুটল গাড়িটা। এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আর লোকটাকে ধরা যাবে না। ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরল মুসা। রবিন আর কিশোর চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ওর দিকে।

'চেহারা দেখতে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না।' মাথা নাড়ল মুসা। 'গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে কী যেন খুঁজছিল। গাড়িটা রেখেছিল ঝোপের ওদিকের রাস্তায়। আমাকে চমকে দিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'পরেরবার ধরা যাবে,' সান্ত্বনা দিল রবিন।

কিশোর বলল, 'কী খুঁজছিল জানা দরকার। গাড়িচোর নয় তো?'

গাড়িতে উঠল ওরা। হ্যান্ডব্রেক খুলে এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। পিছনের সিট থেকে রবিন বলল, 'মুসার গাড়ি চুরি করবে না কোনও চোর। চোরদের একটা প্রেস্টিজ আছে না! এ-জিনিস বেচবে কোথায়? যারা চোরাই মাল কেনে তারা কিনবে তো না-ই, বরং টিটকারি দেবে চোরকে।'

গম্ভীর চেহারা করে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা, কিছু বলল না। ওর পাশেই বসে আছে কিশোর, গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট ঘেঁটে বলল, 'কাগজপত্র সব ঠিকই আছে। ভাগ্যিস মোবাইল ফোনটা বাসায় রেখে এসেছ বলে ওটা নিতে পারেনি। ওয়্যারহাউসে যে কুকুরের হুকটা পেয়েছিলাম, ওটা নিয়ে গেছে। বোধহয় আঙুলের ছাপ ছিল। আগেই ওটা পুলিশের কাছে দেয়া দরকার ছিল আমাদের, পরে দেব ভেবে ভুল করেছি।'

'আর কিছু নেয়নি?' ড্রাইভিঙের ফাঁকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না।'

'খিদে লেগে গেছে,' প্রসঙ্গ পাল্টাল মুসা। 'সেই কখন নাস্তা করেছি, সব হজম হয়ে গেছে।'

'তা হলে বন্দরের দিকে চলো,' বলল কিশোর। 'ওখানে সাগরের তীরের কোনও একটা রেস্তোরাঁয় বার্গার খাওয়া যাবে। তারপর ওখান

থেকে যাব কারিনা মুরের সৎ ভাইয়ের খোঁজ করতে। রেস্তোরাঁগুলোর কাছেই ড্রাই-ডক।'

লাইমস্টোন স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল ওরা, বন্দরে সাগর-তীরে ছোট একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামল। ভিতরে কাস্টোমার অনেক। গমগম করছে গোটা রেস্তোরাঁ। ওরা বসল কিচেনের দরজার কাছেই একটা টেবিলে।

'কী দেব?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল এক তরুণী ওয়েইট্রেস। তার পোশাকে নাম লেখা আছে। রাফেলা জুলিয়ান ।

মুসা অর্ডার দিল। বার্গার, আলুর চপ, পিজা আর কোক। ওয়েইট্রেস চলে যাবার পর ও জিজ্ঞেস করল, 'কী জানা গেল কারিনা মুরের সঙ্গে কথা বলে?'

রবিন আর কিশোর খুলে বলল মহিলার সঙ্গে কী কথা হয়েছে। কিশোর শেষে যোগ করল, 'মিস্টার লেবউফ আর তাঁর ডগ-হাউস দু'চোখে দেখতে পারেন না কারিনা মুর। তাঁর সৎ ভাই হ্যারল্ড মুরেরও ডগ-হাউস সম্বন্ধে একইরকম মনোভাব। উনি বোনের বাড়িতেই থাকেন।'

'তা হলে আমার গাড়িতে হুক খুঁজছিল যে-লোকটা সে তো কারিনা মুরের ভাই হ্যারল্ড মুরও হতে পারে,' বলল মুসা। 'যদি কাজে না গিয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই দেখেছে তার বোনের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখেছি আমরা।' এবার ও বন্ধুদের জানাল গ্যারেজে খুঁজতে গিয়ে কোনও ফায়দা হয়নি। 'জানালায় রং এতো পুরু যে, ভেতরের কিচ্ছু দেখা যায় না। তবে আমি শিওর, ওই গ্যারেজের ভেতর কোনও কুকুর নেই।'

ওয়েইট্রেস ওদের জন্য খাবার নিয়ে এলো। কিশোর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে অনেকদিন ধরে কাজ করেন, মিস রাফেলা?'

'অনেক বেশিদিন ধরে,' মিষ্টি হেসে জবাব দিল ওয়েইট্রেস। 'আমার ইচ্ছে ছিল দু'বছর আগেই আমি দুনিয়া কাঁপানো এক সুপারমডেল হয়ে যাব। কিন্তু এখনও হতে পারিনি। কাজেকর্মে একটু পিছিয়ে পড়েছি বলতে পারো।'

'বুঝতে পারছি আপনার কেমন লাগে,' বলল কিশোর। মুসাকে দেখাল। 'এই যে, নিল আর্মস্ট্রঙের স্যাঙাত লাল লেগউইক। পরের রকেটেই মহাকাশে যাওয়ার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ও। কিন্তু যেতে আর পারছে না কিছুতেই।'

আবার হাসল রাফেলা জুলিয়ান। 'আমাদের এখানে মহাকাশচারীরা প্রায় আসে না বললেই চলে।'

রাফেলা জুলিয়ানের সঙ্গে সহজ, সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বুঝে কিশোর চট করে প্রশ্ন করল, 'নভোচারী তো সহজে আসে না, কিন্তু হলুদ দরজাওয়ালা ধূসর কোনও পুরোনো গাড়ি চালিয়ে কেউ আসে?'

'গাড়িটা দেখেছি,' বলল রাফেলা। 'প্রায়ই এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করে। প্রাচীন একটা জঞ্জাল।'

'আর ওটার ড্রাইভার? গাড়িটা কে চালায় দেখেছেন?'

'দেখেছি। এক যুবক। তবে চেহারা খেয়াল করে রাখিনি। এখনও যদি এখানে এসে ঢোকে তো চিনতে পারব না।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'শেষ কবে গাড়িটা দেখেছেন মনে করতে পারেন?'

সামান্য সময় চিন্তা করল ওয়েইট্রেস, তারপর বলল, 'গতকাল। গতকাল দেখেছি এদিক দিয়ে যেতে।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল কিশোর। 'রাস্তার মাঝখানে একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস আছে, ওখানে কখনও কাউকে ঢুকতে বের হতে দেখেছেন? বা কোনও গাড়ির যাওয়া আসা চোখে পড়েছে?'

'না। আমি মাঝেমধ্যে ওটার কাছে গাড়ি রাখি, কিন্তু কাউকে কখনও দেখিনি।' ভ্রূ নাচাল রাফেলা জুলিয়ান কিশোরের দিকে তাকিয়ে। 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমরা কি গোয়েন্দা না কি?'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওয়্যারহাউসের দরজা সবসময় খোলা থাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রাফেলা। 'তা-ই তো দেখেছি।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'ওই গাড়ির ড্রাইভারের ব্যাপারে জানতে চাইছ কেন, টাকা পাও তোমরা তার কাছে?'

'না, খুঁজছি সে একটা কুকুর চুরি করেছে বলে,' জানাল মুসা।

কাউন্টারের কাছে রিংটিং করে একটা বেল বেজে উঠল। 'ডাকছে,' হাতের ইশারা করে কিচেনের দিকে চলে গেল রাফেলা জুলিয়ান।

খেতে শুরু করল মুসা। মাঝে মাঝে কোকে চুমুক দিচ্ছে। রবিন আর কিশোরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাওয়া শেষে মিষ্টি হিসাবে আপেলের পাই নিল ওরা। মুসা সেই সঙ্গে পিচও খেল। বিল আসার পর তিনজন ভাগ করে মিটিয়ে দিল টাকাটা।

কাউন্টারের পাশের পে-ফোন থেকে রকি বিচের সরকারী কর বিভাগে নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করল কিশোর। কর অফিসে মিস্টার ভিক্টর সাইমনের পরিচিত এক ভদ্রলোক কাজ করেন। তিনি ওদেরও পরিচিত। রিচার্ড বার্লিসন নাম তাঁর। পাওয়া গেল তাঁকে। কিশোরের কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে ওয়্যারহাউসটার মালিক কে সেটা খুঁজে বের করে রাখব। আমার মোবাইল ফোন নষ্ট। কাজটা অফিসের কোনও ব্যাপার নয়, কাজেই অফিসের ফোনটা ব্যবহার করতে চাই না। দু'ঘণ্টা পর তোমরা অফিসে এলে আশা করি জানাতে পারব যা জানতে চাও।'

ওদের হেডকোয়ার্টারের ফোন আর মোবাইল ফোন–দুটোর নাম্বারই তাঁকে দিল কিশোর, ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল। বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে বলল, 'ড্রাই-ডক খুবই কাছে, চলো হেঁটেই যাওয়া যাক।'

হাত নেড়ে জুলিয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা, তারপর বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

ড্রাই-ডকে যে ক্রুজ শিপটা মেরামত হচ্ছে ওটার নাম স্টার অভ বারমেট। তিন তলা সমান উঁচু হবে অন্তত। বিশাল ডক থেকে র‍্যাম্প আর গ্যাঙওয়ে দু'পাশ দিয়ে উঠে গেছে ওটার উপর। সূর্য বাঁচিয়ে ক্রেনের মাথা আর বূমগুলোর শীর্ষ দেখার জন্য তিন গোয়েন্দাকে চোখের উপর হাত রাখতে হলো। জাহাজের উপর ঝুঁকে আছে ওগুলো, দেখলে মনে হয় সরু রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো বড় বড় গাছ রাস্তাটাকে উপর থেকে ঢেকে রেখেছে।

'ওই যে ফোরম্যানের ঘর,' জাহাজের বো'র সামনে ভ্রাম্যমাণ একটা ধাতব কুটির দেখাল কিশোর। শিপইয়ার্ডের চওড়া দরজা দিয়ে ভিতরে

ঢুকল ওরা। চারপাশে কর্মীদের ব্যস্ততা, মেশিনের গুঞ্জন।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই শক্ত হ্যাট পরা একজন লোককে দেখতে পেল ওরা। তাঁর হ্যাটে ফোরম্যান শব্দটা লেখা রয়েছে। ভদ্রলোকের সামনে থেমে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর, তারপর কার খোঁজে এসেছে জানাল।

'হ্যারল্ড মুর?' নামটা আউড়ালেন ফোরম্যান। 'দাঁড়াও, দেখে বলতে হবে।' পকেট থেকে একটা কালো রঙের নোটবুক বের হলো তাঁর। কাগজ উল্টাতে উল্টাতে ফোরম্যান আপনমনে বললেন, 'আজকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।' আজকের উপস্থিতির তালিকা পেয়ে চোখ বুলাতে শুরু করলেন, তারপর দেখা শেষে মুখ তুললেন। 'নোপ। আজকে ওর আসার দিন নয়।'

বিদায় নিয়ে ড্রাই-ডক থেকে বেরিয়ে আসার পর মুসা বলল, 'আমাদের কাজ কিছুই এগোচ্ছে না।'

'চলো, সৈকত ধরে কিছুক্ষণ ঘুরি,' প্রস্তাব করল রবিন। 'রাফেলা বলেছে কালকে সে ধূসর গাড়িটা দেখেছে। কপাল ভাল হলে আমরাও হয়তো ওটার দেখা পেয়ে যাব।'

হাঁটতে হাঁটতে নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, আপনমনে তদন্তের কথা বলতে শুরু করল, 'আমরা এক মহিলাকে চিনি, যিনি বিড়াল ভালবাসেন আর কুকুর ঘৃণা করেন। কিন্তু ডগ-হাউস বন্ধ করতে যা কিছু তিনি করেছেন, সবই আইনত সঠিক। আমাদের হাতে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে কোলিটা চুরি হওয়ার সঙ্গে তিনি কোনভাবে জড়িত। এদিকে হ্যারল্ড মুর যেহেতু কাজে আসেনি, সে আমাদের গাড়িতে খুঁজে থাকতে পারে। হুকটা হয়তো সে-ই নিয়ে গেছে। এমনও হতে পারে সে কারিনা মুরের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুনেছে, তারপর ঠিক করেছে এ-ব্যাপারে নিজে সে কিছু করবে।'

'সবই আন্দাজ,' বলল মুসা। 'আমাদের হাতে নিরেট প্রমাণ নেই।'

হাঁটছে ওরা, এদিক ওদিক চোখ বুলাচ্ছে। কোথাও ধূসর গাড়িটা চোখে পড়ছে না। হাঁটতে হাঁটতে সেই পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের কাছে চলে এসেছে ওরা। 'একবার খুঁজে দেখা যায় ওখানে,' বলল রবিন।

'হয়তো নতুন কিছু চোখে পড়ে যেতে পারে।'

'ফটকটা দেখছি বন্ধ,' বিড়বিড় করল কিশোর, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'জুলিয়ান বলেছিল না দরজা সবসময় খোলা থাকে?'

ধীরে চলা একটা লাল পিকআপ ট্রাক পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, তারপর রাস্তা পার হয়ে ওয়্যারহাউসের দরজার কাছে চলে এলো। ঘুরেফিরে দেখল, দু'দিকের দুটো দরজাই বন্ধ, তালা মারা।

'এতোদিনে সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে মালিকের হুঁশ হয়েছে,' বলল মুসা।

কিশোর সামনের ফটকের এক পাশে ছোট্ট একটা কাগজ দেখাল। ওতে লেখা: এই ওয়্যারহাউস বিক্রি হইবে।

'অবশ্য এমনও হতে পারে কেউ চায় না আমরা ভেতরে ঢুকতে পারি,' বলল কিশোর।

আবার মস্ত বাড়িটার পিছনে চলে এলো ওরা। একটা জানালা নীল ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ক্যানভাসটা তুলল মুসা। ভিতরে তাকিয়ে বলল, 'একটা ডেস্ক দেখতে পাচ্ছি। একটা চেয়ারও আছে। এটা সেই ঘর, যেটাতে পিট বুলটাকে ছেড়ে গিয়েছিল কুত্তাচোরা। অফিসটা পরিষ্কার করা হয়েছে।'

পাশ থেকে উঁকি দিল কিশোর, মেঝেতে পড়ে থাকা হলদে কাগজটা ওর চোখে পড়ল। একটা জিনিস ওর নজরে পড়েছে। মুসাকে বলল, 'ক্যানভাসটা তুলে রাখো, আমি ওই কাগজটা চাই।' জানালার কিনারা দিয়ে ঝুঁকে মেঝে থেকে পুরোনো খবরের কাগজটা সাবধানে তুলে আনল ও। ওটার ভাঁজ থেকে ছোট একটা ভিজিটিং কার্ড খসে পড়ল নীচে। ওটা তুলল কিশোর। বলল, 'গতকাল এটা চোখে পড়েনি।' মুসা আর রবিনকে কার্ডটা দেখাল ও।

'এক্সেলসিয়র ল্যাবোরেটরিজ,' জোরে জোরে পড়ল রবিন। 'এখানে সব ধরনের পরীক্ষা করা হয়।'

স্বাভাবিক ভাবেই ঠিকানা দেওয়া আছে কার্ডে। রকি বিচের উত্তর প্রান্তে ল্যাবোরেটরিটা। 'আমাদের তদন্তের সঙ্গে এই ল্যাবোরেটরির

কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'হয়তো ওয়্যারহাউসে কাজ করত এমন কেউ ফেলে গেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে আসলে এটা ফেলে গেছে রাফিয়ানের অপহরণকারী।' কার্ডটার অপর পিঠ দেখল ও, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে উঠল। পেন্সিল দিয়ে একটা নাম লেখা আছে পিছনে। ম্যানর। কার্ডটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। আপনমনে বলল, 'এই ম্যানরটা কে হতে পারে?'

'আল্লাহ্ জানেন,' বিড়বিড় করল মুসা। রবিন কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওয়্যারহাউসের মালিক কে সেটা আগে জানতে হবে আমাদের,' বলল কিশোর। 'চলো, সরকারী কর অফিসে যেতে হবে।'

রেস্তোরাঁর সামনে ফিরে এলো ওরা, ফোক্সওয়াগেন চেপে রওনা হলো মূল শহরের দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে মুসা, চলেছে টাউন স্কয়ারে। দুপুরের এই সময়ে ওখানে গাড়ি পার্ক করা বিরাট ঝামেলার কাজ। তবে মুসা পারল। একটা দামি স্পোর্টস্ কার খালি জায়গাটায় ঢোকার আগেই তোবড়ানো ফোক্সওয়াগেন ঢুকিয়ে ফেলে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল মুসা।

'চলো,' গাড়ির দরজায় তালা মারার পর বলল মুসা, 'দেরি করতে চাই না। আমার আবার খিদে লেগে গেছে।'

আশ্চর্যজনক হলেও রাস্তায় গাড়ির ভিড় তেমন একটা নেই। যাত্রীর দিকের দরজা খুলে নেমে পড়েছে রবিন, এবার কিশোর নামল। রবিন আর মুসা ফুটপাথে উঠে গেছে। একটা ফ্যাকাসে লাল পিকআপ ট্রাক বাঁক ঘুরতে দেখল কিশোর। ফোক্সওয়াগেনের দরজাটা বন্ধ করতে করতে শুনতে পেল এঞ্জিনের গর্জন। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ছুটে আসছে ট্রাকটা।

মুখ তুলে ও দেখল, রাস্তার মাঝখান থেকে সরাসরি ফোক্সওয়াগেনকে লক্ষ্য করেই তেড়ে আসছে ট্রাক। 'করে কী!' চিৎকার করল মুসা। 'কিশোর, সাবধান!'

ফোক্সওয়াগেনের সামনে দু'ফুট ব্যবধানে আরেকটা গাড়ি রাখা

আছে, সেই ফাঁকটার দিকে দ্রুত এগোল কিশোর। পা বাড়িয়েই টের পেল, বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে। সোজা সামনের গাড়ির নাকে দড়াম করে গুঁতো মারল ট্রাক। প্রচণ্ড ধাক্কার কারণে গাড়িটার হ্যান্ডব্রেক ওটাকে জায়গায় রাখতে পারল না। পিছলে গেল চাকাগুলো। হড়কে পিছাতে শুরু করল গাড়িটা। মুসার ফোক্সওয়াগেন আর ওটার মাঝখানের ফাঁক নিমেষে কমে আসছে। রবিন আর মুসা স্পষ্ট বুঝতে পারল, দ্রুত সরতে না পারলে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে কিশোরের পা!

পাঁচ

ঝট করে ফোক্সওয়াগেনের বোঁচা নাকের উপর উঠে পড়ল কিশোর। আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, ওয়াইপার দুটো ধরে তাল সামলাল। ঠিক তখনই সামনের গাড়িটার পিছনের দিক ফোক্সওয়াগেনের সামনের বাম্পারে ধাক্কা মারল। বাড়ি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়ি দুটো। লাফ দিয়ে ফোক্সওয়াগেন থেকে পাশের ফুটপাথে নামল কিশোর। পিকআপ ট্রাক ততোক্ষণে পিছিয়ে গেছে, স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসা লোকটার মুখ এক পলকের জন্য দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। একটা রাবারের মুখোশ পরে আছে সে। গর্জন তুলে ছুটতে শুরু করল ট্রাক, সামনের বাঁকটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েকজন পথচারী থেমে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন চেহারায় ঘিরে ফেলল ওদের। সবাই জানতে চাইছে কিশোর আহত হয়েছে কি না, তাকে হাসপাতালে নিতে হবে কি না। তেমন কিছু হয়নি বলে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করল কিশোর। ওর পাশে চলে এসেছে রবিন আর মুসা।

রবিন বলল, 'ইচ্ছে করে কাজটা করেছে লোকটা।'

'একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পেয়েছি কী করতে যাচ্ছে,' ব্যথায় বিকৃত মুখে জানাল কিশোর, দু'হাতে গোড়ালি মালিশ করছে। 'লাইসেন্স নাম্বারটা খেয়াল করেছ কেউ?'

'না,' হতাশ দেখাল মুসাকে। 'তবে যাবার সময় আমার গাড়িতে ঘষা খেয়েছে তার ট্রাকের পাশ। লাল রং লেগে গেছে।'

'ঠিক এই রঙের একটা ট্রাক দেখেছি আমি বন্দরের কাছে,' বলল রবিন। 'মনে নেই? ওয়্যারহাউসে যাবার সময় পাশ কাটাল যেটা।'

'মনে পড়েছে,' বলল মুসা। 'তখন লোকটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল।'

'হয়তো আমাদের নজরে রাখছিল, সেটাই আস্তে যাবার কারণ,' বলল কিশোর। 'বোধহয় আমাদের গাড়ি অনুসরণ করে এখানে এসে হাজির হয়েছিল।' টাউন স্কয়ারে চোখ বুলাল কিশোর। উদ্বিগ্ন পথচারীরা খারাপ্ কিছু ঘটেনি বুঝে যার যার মতো সরে পড়েছে। কিশোর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, মুসার কাঁধে ভর দিয়ে বলল, 'লোকটা অনেক আগেই ভেগেছে। চলো, কর অফিসে যাওয়া যাক।'

রাস্তা পার হয়ে কর অফিসে ঢুকল ওরা। কিশোর চেনে তেতলার কোথায় বসেন ভদ্রলোক, সেখানে চলে এলো। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ওদের দেখে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মিস্টার বার্লিসন মিটিঙে ব্যস্ত। ধারণা করেছিলেন তোমরা আসতে পারো। এটা আমার কাছে রেখে গেছেন তোমরা এলে দেবার জন্যে।'

কাগজে লেখা: দুঃখিত, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে আগামী কয়েক ঘণ্টা কারও সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। অফিসে নতুন কম্পিউটার বসানো হচ্ছে, আমি সেটার দায়িত্বে আছি। জিনিসটা এখনও ঠিক মতো কাজ করছে না। তবে আজ বিকেলের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। তখন ওয়্যারহাউসের মালিক কে সেটা জানাতে পারব। আমি ভুলিনি। পরে যোগাযোগ কোরো।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে কিশোর বলল, 'আয়োলাকে আমরা বলেছিলাম আজকে ডগ-হাউসে তদন্ত করতে যেতে পারি। চলো, গিয়ে দেখা যাক সে ওখানে আছে কি না।'

'তার আগে লাঞ্চ,' গাড়িতে উঠে বলল মুসা।

বার্গার হাউসের সামনে থামল ওরা, কিশোর-রবিন একটা করে বার্গার আর কোক নিল। মুসা তিনটে বার্গার সাবড়ে দিল, সেই সঙ্গে দুই ক্যান কোক।

খাওয়া শেষে পে-ফোন থেকে ডগ-হাউসের নাম্বারে ফোন করল কিশোর। ফোন তুললেন মিস্টার লেবউফের স্ত্রী। কিশোরের জিজ্ঞাসার জবাবে জানালেন, আজকে দুপুরটা ছুটি নিয়েছে আয়োলা মর্টন, তারপর বললেন, 'ওকে আমাদের রাতের শিফটের জন্যে দরকার হবে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের ওখানে আর কোনও সমস্যা হয়েছে?'

'না, সব ঠিক আছে,' জানালেন মহিলা। 'আমার মনে হয় চুরিটা করে দূরে কোথাও চলে গেছে চোর। মুক্তিপণ চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে পরে।' একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'তুমি চাইলে আয়োলার অ্যাপার্টমেন্টের ফোন নাম্বার দিতে পারি। বেশিরভাগ সময়েই ও বাড়ি থাকে না, তবে আনসারিং মেশিন আছে ওর।'

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা মুখস্থ করে নিল কিশোর। মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে আবার ফোন করল আয়োলার নাম্বারে।

ওপ্রান্তে রিসিভার তোলার আওয়াজ পেল, তারপর পরিচিত কণ্ঠ বলে বলল, 'মিস আয়োলা? আমি কিশোর পাশা।'

'হাই!' বলে উঠল আয়োলা। 'তদন্তের কাজ এগোল? আমার ফোন নাম্বার পেলে কোথায়?'

'মিসেস লেবউফের কাছ থেকে,' বলল কিশোর। 'তদন্তের ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ ছিল। আমরা কি আপনার বাসায় আসতে পারি? ফ্রী আছেন আপনি?'

'আমার অ্যাপার্টমেন্ট একেবারেই অগোছাল,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল আয়োলা, 'এসো, অন্য কোথাও দেখা করি।'

'আমরা বার্গার হাউসে আছি,' ঠিকানা দিয়ে বলল কিশোর। 'এখানে দেখা করবেন?'

'কোনও অসুবিধে নেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে আসব আমি।' ফোন রেখে দিল আয়োলা মর্টন।

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথাতেই হাজির হলো তরুণী। বাস থেকে নেমে এগিয়ে এলো বার্গার হাউসের দিকে। সামনের আঙিনায় ওর জন্য

অপেক্ষা করছিল কিশোর-মুসা-রবিন, ওদের দেখে হাসল আয়োলা, হাত মিলিয়ে বলল, 'কী খবর? হঠাৎ এতো জরুরি তলব? তদন্তের কাজ এগিয়েছে নিশ্চয়ই?' ছেড়ে যাওয়া বাসটা দেখাল তরুণী, তারপর ব্যাখ্যা করল, 'আমার গাড়ি মেরামত করতে দিয়েছি।...এবার বলো কী জন্য ডেকেছ।'

'বলছি,' মুসাকে ইশারা করল কিশোর।

বার্গার হাউস থেকে চারটে কোকের ক্যান কিনে নিয়ে এলো মুসা, তারপর রাস্তা পেরিয়ে পার্কের বেঞ্চে বসল ওরা চারজন। মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে ওক গাছের ঘন সবুজ পাতা। ঝিরঝিরে বাতাস বিলি কাটছে ওদের চুলে।

'যেজন্যে আপনাকে ডাকা,' শুরু করল কিশোর, 'মিস্টার লেবউফ মনে করেন মিস কারিনা মুর কুকুরচুরির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত। আমরা যেটা জানতে চাইছি সেটা হলো, আপনার উপস্থিতিতে কারিনা মুর কি হুমকিমূলক কিছু করেছেন?'

'ফোন করা হয়েছে কয়েকবার, আগেই বলেছি,' বলল আয়োলা, দু'ঢোক কোক খেল। 'কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারব না যে ওসব ফোন কারিনা মুরই করেছে।'

'আর তাঁর ছোট ভাই? হ্যারল্ড মুর? সে কি ফোন করে থাকতে পারে? বা কুকুর চুরির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা সম্ভব?'

কী যেন ভাবল আয়োলা, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'না, মনে হয় না। হ্যারল্ডকে আমি চিনি। কয়েকদিন আমাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে চেয়েছে সে, যেতে পারিনি। রাতের ডিউটি করতে হলে সামাজিকতার আর উপায় থাকে না। জানো, লোকটা কী বলেছিল? বলেছিল ডগ-হাউস বন্ধ হয়ে যাবেই, তারপর তার সঙ্গে ঘুরতে যেতে অনেক সময় হাতে পাবো আমি।'

'ডগ-হাউস যখন প্রথম চালু হলো তখন যে-মহিলা ওখানে কাজ করতেন,' বলল কিশোর, 'জেসিকা স্প্রিংগার। তিনি তো চাকরি ছেড়েছেন আরও ভাল একটা কাজ পেয়ে, ঠিক?'

'চাকরিটা সে ভাল চাকরি পেয়েছে বলেই শুধু ছাড়েনি,' বলল

আয়োলা। 'আসলে মিস্টার লেবউফ যখন তার বদলে নিজের স্ত্রীকে ম্যানেজার করলেন, তখন সে আর চাকরি করতে চায়নি। জেসিকা স্প্রিংগার এতো বিস্মিত হয়েছিল কেন সেটা আমার মাথায় ঢোকে না। এমন ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটে।'

তথ্যগুলো দ্রুতহাতে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে রবিন। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার লেবউফ বা তাঁর স্ত্রীকে কোনওরকম হুমকি দিয়েছিলেন জেসিকা স্প্রিংগার?'

'ভীষণ খেপে গিয়েছিল। যা-তা বলছিল। পাগলের প্রলাপ সব। নানারকম হুমকি দিয়েছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল তার যেসব ডিগ্রি আছে তাতে সে-ই আসলে ম্যানেজার পদের জন্যে উপযুক্ত। তারপরও নিজের স্ত্রীকে ম্যানেজার করে পার্শিয়ালটি করেছেন মিস্টার লেবউফ। হুমকি দিয়ে বলেছিল, বোমা মেরে পুরো বিল্ডিং সে ধসিয়ে দেবে। খুব খেপেছিল মহিলা।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ডগ-হাউসের চাকরি ছাড়ার পর জেসিকা স্প্রিংগারের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?'

'দু'একবার হয়েছে,' বলল আয়োলা। 'তার নতুন অফিসে ফোন করেছিলাম কেমন আছে জানতে।'

'এখন তো তিনি পোষা প্রাণীদের খাবারের দোকানে কাজ করেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। ওখানে ম্যানেজারের কাজ পেয়েছে। রকি বিচ মলের উল্টোদিকেই দোকানটা। অনেক বড় দোকান। ভাল ব্যবসা করে।'

'আরেকজনের কী হলো?' কোকে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'যাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল? সেই অ্যানিমেল টেকনিশিয়ান?'

চট করে ঘড়ির দিকে একবার তাকাল আয়োলা। 'নিক মিলহিজার?' কাঁধ ঝাঁকাল তরুণী, উঠে দাঁড়াল। 'তার ব্যাপারে কিছু জানি না। এবার আমাকে যেতে হবে। ও, একটা কথা, যদি তোমরা জেসিকা স্প্রিংগারের সঙ্গে দেখা করো, তা হলে আমার তরফ থেকে তাকে হ্যালো বোলো।'

মুসা জিজ্ঞেস করল আয়োলা মর্টনকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে কি না। জবাবে ধন্যবাদ দিল আয়োলা, তারপর জানাল তার একটা

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

বিদায় নেওয়ার আগে কিশোর বলল, 'আমাদের মনে যদি আরও কোনও প্রশ্ন আসে তা হলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই!' মৃদু হাসল আয়োলা মর্টন, হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। আধ মিনিটের মাথায় একটা বাস এলো। ওটায় উঠে পড়ল। রওনা হয়ে গেল বাস।

'এবার কী করা যায়?' নোটবুক পকেটে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আগে কোক শেষ করি, তারপর ভাবা যাবে,' মুসা জবাব দিল।

কিশোর বলল, 'তাড়াতাড়ি শেষ করো। আমরা ওই পেট-শপে যাব।'

বিশ মিনিট পর রকি বিচ মলের কাছে পৌঁছোল তিন গোয়েন্দা। একটা পার্কিং লটের পিছনের দিকে বিরাট পেট-শপটা। সামনে বিশাল ব্যানারে লেখা: এখানে জন্তু-জানোয়ারের সবধরনের খাবার পাওয়া যায়।

দোকানের সামনে গাড়ি রেখে নামল ওরা, ভিতরে ঢুকে একজন ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করতেই জেসিকা স্প্রিংগারকে দেখিয়ে দিল সে।

মহিলার বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। সোনালী চুল, বেণি করেছেন। একটা ক্যাশ রেজিস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লার্ককে বলছেন কী যেন। অপেক্ষা করল ওরা, জেসিকা স্প্রিংগারের কথা শেষ হতেই কিশোর সামনে বেড়ে নিজেদের পরিচয় দিল। এবার বলল, 'ডগ-হাউসের ব্যাপারে আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল।'

জেসিকা স্প্রিংগারের হাসি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কঠোর আর শীতল হয়ে গেল নীল চোখ জোড়ার দৃষ্টি। ক্লার্কের দিকে ফিরে বললেন অফিসে পাওয়া যাবে তাঁকে, তারপর তিন গোয়েন্দাকে হাতের ইশারায় সঙ্গে আসতে বলে দোকানের পিছনের দিকে পা বাড়ালেন।

উঁচু করে রাখা দু'সারি খাবারের বাক্সের ভিতর দিয়ে সরু করিডর ধরে হাঁটছে ওরা। কিশোর লক্ষ করল, জন্তু বুঝে সাজানো হয়েছে পুরো দোকানটা। একদিকে কুকুরের খাবার, আরেকদিকে বিড়ালের। আরও আছে খরগোশ, আর নানা জাতের পাখি এবং চারপেয়েদের খাবারের

[illegible]। মাছের জন্যও বিরাট একটা সেকশন রাখা হয়েছে। তার পাশেই অজগরের জন্য খাবার। দোকানের ভিতর কুকুরের ঘেউঘেউ আর টিয়া পাখির টিটি আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা।

'পত্রিকায় পড়েছি কুকুর চুরি আর মুক্তিপণ চাওয়ার ব্যাপারটা,' হাঁটতে হাঁটতে বললেন জেসিকা স্প্রিংগার। একটা শপিং কার্টকে পাশ কাটালেন। দু'পাশ থেকে ফর্কলিফটে করে খাবারের বাক্স আর বস্তা [illegible]-নামানো চলছে। কেনাবেচা যেখানে হয় তার পিছনের অংশে [illegible] কয়েকটা অফিসের পাশে জেসিকা স্প্রিংগারের অফিস। ভিতরে ঢুকলার পর হাতের ইশারা করলেন মহিলা। 'বসো।'

বসল তিন গোয়েন্দা। সরাসরি কাজের কথায় এলো কিশোর। 'শুনলাম মিস্টার লেবউফ আর আপনার সম্পর্ক ভাল নয়। চাকরি ছাড়ার সময় নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল।'

'বলার মতো তেমন কিছু নয়,' সহজ গলায় বললেন মিস জেসিকা। 'যখন সে চেইন ডগ মোটেল খুলল তখন তার আচরণ দেখে আমার মনে হয়েছিল ডিসট্রিক্ট ম্যানেজারের পদটা সে আমাকেই দেবে। পরে সে মত বদলায়, নিজের বউকে ম্যানেজার করে।'

'জানা যায় তারপর আপনি নানা ধরনের হুমকি দেন তাঁকে,' নরম গলায় বলল কিশোর।

'তা দিই,' স্বীকার করে নিলেন জেসিকা স্প্রিংগার। 'মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল আমার। তোমরা কী শুনেছ আমি জানি না, তবে কোনও কুকুর চুরি করার কথা কখনোই বলিনি আমি।' সামনে ঝুঁকে কিশোরের চোখে তাকালেন মিস জেসিকা। 'লেবউফ আমাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সিদ্ধান্ত পাল্টে আমার বদলে নিজের বউকে ম্যানেজার করে সে।'

'আপনি তো এখানে ম্যানেজার,' বলল মুসা। 'এই কাজটা ডগ-হাউসে কাজ করার চেয়ে ভাল নয়?'

'ভুল শুনেছ তোমরা,' চেয়ারে হেলান দিলেন মিস জেসিকা। 'আমি এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

ভদ্রমহিলার বলার ভঙ্গিতে গর্বের সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পেল না কিশোর। মহিলা নিশ্চয়ই মনে করেন না এই চাকরিটা ডগ-হাউসের

চাকরির চেয়ে ভাল।

আবার বলতে শুরু করলেন জেসিকা স্প্রিংগার। 'এখানে আমাকে শুধু ম্যানেজারিয়াল কাজই নয়, অন্য অনেক কাজই করতে হয়। অফিস ছুটির পর আমি ট্রাক থেকে মালও নামাই। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদটা আসলে গালভরা একটা নাম। কেরানির কাজও করতে হয় আমাকে। মোট কথা, যখন যে-কাজে দরকার পড়ে, সে-কাজই করতে হয়।'

'আপনারা তো দেখছি জন্তু-জানোয়ারের খাবার বিক্রির পাশাপাশি ওগুলো বিক্রিও করেন,' বলল মুসা। পরক্ষণেই যোগ করল, 'ডগ-হাউস থেকে যে কোলি কুকুরটা চুরি গেছে ওটা খুব দামি কুকুর।'

'আমরা শুধু বাচ্চা কুকুর বিক্রি করি,' প্রতিবাদের সুরে বললেন জেসিকা। 'আর ওগুলো কেনা হয় নামকরা ব্রিডারদের কাছ থেকে। এ-ব্যাপারে বিস্তারিত ফাইল সংরক্ষণ করি আমরা।'

মিস জেসিকা স্প্রিংগারের পিছনের ফাইল কেবিনেটে অনেকগুলো লেবেল আঁটা রয়েছে। পিওরব্রিডস লেখা একটা লেবেল কিশোরের নজর কাড়ল। মিস জেসিকার টেবিলেও কয়েকটা ফাইল রয়েছে। তার একটাতে লেখা: ক্যানাইন অ্যাডপশন্স, অর্থাৎ ওটাতে পাওয়া যাবে কোন্ কুকুর কে কিনেছেন।

চোখ তুলে কিশোর লক্ষ করল ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন জেসিকা স্প্রিংগার। বললেন, 'তোমরা যদি মনে করো এখানে কোনও চোরাই কুকুর আছে, তা হলে খুঁজে দেখতে পারো।' টেবিলের ফাইলগুলোর উপর একটা বিড়ালের ম্যাগাজিন রাখলেন তিনি। এবার তাঁর গলা কড়া শোনাল। 'আমাদের ফাইল বাইরের কারও দেখার অনুমতি নেই।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল কিশোর।

'যাঁদের কাছে আমরা জন্তুজানোয়ার বিক্রি করি তাঁদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়,' বললেন জেসিকা। 'তবে তোমরা ঘুরে দেখতে চাইলে নিক মিলহিজার ফিরলে ঘুরে দেখাতে পারবে।'

'নিক মিলহিজার এখানে চাকরি করেন?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল মুসার।

'ডগ-হাউসে যিনি চাকরি করতেন তিনিই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'করলে তোমাদের কোনও অসুবিধে আছে?' জেসিকা স্প্রিংগারের চেহারায় বিরক্তির ছাপ পড়ল।

'না, তা নেই,' নিজের সেরা বিনয়ী হাসিটা উপহার দিল কিশোর। 'কিন্তু দু'জন মানুষ যদি এক জায়গায় কাজ করে, যারা ডগ-হাউস থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে এসে অন্যখানে কাজ নিয়েছে, তা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে।'

'তোমার কথাটা আমি ধরলাম না,' বললেন জেসিকা। 'তবে এবার তোমরা আসতে পারো। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

'আমরা নিক মিলহিজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর। 'সেটা সম্ভব?'

'এখন নয়। ও একটা ডেলিভারি দিতে গেছে।' ফাইলে চোখ নামালেন জেসিকা।

'কখন ফিরবেন উনি?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না।' অফিসের দরজা দেখালেন জেসিকা। 'এবার তোমরা এসো। আমাকে কাজ করতে হবে।'

'এতো সাহায্য আর আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল মুসা।

জেসিকা স্প্রিংগারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

'আমরা কুকুরের খাবার কিনলে হয়তো উনি খুশি হতেন,' মন্তব্য করল মুসা। হাত তুলে স্টোররুমের হাজার হাজার পাউন্ড পেট-ফুড দেখাল ও। খাবারগুলো আছে বিশ পাউন্ডের ব্যাগে। একটার উপর আরেকটা রেখে দেয়ালের মতো উঁচু করা হয়েছে ব্যাগগুলো। পুরো দশফুট উঁচু। বস্তার সারি সারি দেয়ালের মাঝখানে সরু করিডর।

ওয়্যারহাউসে কাজকর্মের আওয়াজ হচ্ছে, গুদামের কাছেও ভেসে আসছে সেই শব্দ। ধপ করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, যেন খাবারের কোনও ব্যাগ উপর থেকে পড়েছে। ওরা যেখানে আছে তার সামনে বাঁক ঘুরে চওড়া একটা করিডরে হাজির হলো একটা হলদে ফর্কলিফট। ইলেক্ট্রিক মটরের গুঞ্জন ক্রমেই জোরাল হচ্ছে। ওদের পাশের আরেকটা করিডরে চলে গেল ওটা।

ওরা যে করিডরে আছে সেটা এতো সরু যে দু'জন একসঙ্গে হাঁটা যায় না দু'পাশে খাবারের বস্তার দেয়াল। সামনে হাঁটছে মুসা। কী যেন বলতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় থপ করে একটা জোর শব্দ হলো। হঠাৎ ওর একদিকের ডগ-ফুডের বস্তার দেয়াল নড়ে উঠল। মুসার সামনে ধপাস করে পড়ল একটা বস্তা।

'সাবধান!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'এদিকে আমরা আছি!'

এখনও কাত হচ্ছে বস্তার দেয়াল। ওদিক থেকে ঠেলা দিচ্ছে সেই ফর্কলিফট।

উপর দিকে তাকাল মুসা। দেখল যে-কোনও মুহূর্তে দেয়ালের বড় একটা অংশ ধসে পড়বে।

'মুসা! পিছিয়ে এসো!' চেঁচাল কিশোর।

গলা কেঁপে গেল রবিনের। 'মুসা! জলদি!'

কিশোর আর রবিন দ্রুত পিছাতে শুরু করেছে।

একবার উপরে তাকিয়েই মুসা বুঝে ফেলল ওর পক্ষে আর সরে যাওয়া সম্ভব নয়। অজান্তেই মাথা ঢাকল ও দু'হাত দিয়ে। ধপাধপ পড়তে শুরু করেছে বিশ পাউন্ড ওজনের বস্তা!

প্রথম বস্তাটাই ওর মাথার উপর পড়ল। পরের দুটো ওর কাঁধে। ওজনের কারণে বসে পড়তে হলো মুসাকে। আরও কয়েকটা বস্তার আঘাতে কাত হয়ে পড়ে গেল ও মেঝেতে। জলপ্রপাতের পানি যেমন অবিরাম পড়ে, তেমনি করে বস্তার পর বস্তা পড়তে শুরু করল ওর উপর। এক পাশের পুরো দেয়াল ধসে পড়ছে! টন টন ডগ-ফুডের বস্তার নীচে জীবন্ত কবর হয়ে গেল ওর।

ছয়

অন্তত এক টন ওজনের অনেকগুলো বস্তা পড়ে ঢেকে ফেলেছে মুসাকে। মিহি ধুলো উড়ছে চারপাশে, সামনেটা ঠিক মতো দেখা যায় না। পাঁচ সেকেন্ড হলো থেমে গেছে বস্তা পড়া। ধুলোর মধ্যে দিয়ে ত্রস্ত পায়ে

এগোল রবিন আর কিশোর। রবিন ডাকল, 'মুসা! মুসা!'

জবাব নেই!

'মুসা!' গলা আরও চড়ে গেল রবিনের। তারপর কিশোরকে পাগলের মতো বস্তা সরাতে দেখে হাত লাগাল ও-ও।

শ্বাসের ফাঁকে কিশোর বলল, 'তাড়াতাড়ি, রবিন, মুসা দম আটকে মারা যেতে পারে!'

একটা একটা করে বস্তা সরাচ্ছে ওরা, ছুঁড়ে ফেলছে পিছনে। দোকানের কেউ এখনও জানে না এখানে কী ঘটেছে। কাউকে আসতে দেখা গেল না। ফর্কলিফটের এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে চলে যাচ্ছে।

পনেরো-বিশটা বস্তা সরানোর পর একটা গোঙানি শুনতে পেল ওরা। আরও কয়েকটা বস্তা সরিয়ে ফেলার পর মুসার মাথা আর কাঁধ দেখতে পেল।

'মুসা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। রবিন আর ও ব্যস্ত হাতে মুসার শরীরের উপর থেকে বস্তা সরাচ্ছে।

মুসা নড়ে উঠল। গা থেকে শেষ দুটো বস্তা সরিয়ে উঠে বসল ও, হাত দিয়ে কোমর ডলতে ডলতে বিড়বিড় করে বলল, 'খাইছে! খাবার ভালবাসি আমি, কিন্তু তাই বলে এতো খাবার!'

কাঁধ ধরে মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর।

কোমর ডলছে মুসা, মুখ বিকৃত করে বলল, 'খাইছে! আমার কপালে আজকে হেভি খাবার ছিল!'

'কিছু ভাঙেটাঙেনি তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, বেঁচেই থাকব মনে হচ্ছে,' জবাব দিল মুসা।

ধুলো সরে গেছে। ভাঙা দেয়ালের ওপাশে বেশ খানিকটা দূরে ফর্কলিফটা দেখতে পেল ওরা। যন্ত্রটার ড্রাইভিং সিটে কেউ নেই!

মুসা ঠিক আছে বুঝে হাতের ইশারা করল কিশোর, ফিরে চলল ওরা জেসিকা স্প্রিংগারের অফিসে। নক না করেই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কিশোর। ওর ঠিক পিছনেই থাকল মুসা আর রবিন।

কাগজে কী যেন লিখছিলেন জেসিকা, দরজা খোলার আওয়াজে মুখ

তুলে তাকালেন। ওদের দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাঁর। 'এখানে এখনও কী করছ তোমরা?'

'এই মাত্র আমাদের খুন করতে চেয়েছিল কেউ,' বলে উঠল রবিন।

'তা-ই না কি?' বিদ্রূপের হাসি হাসলেন জেসিকা। 'গল্প বলতে হলে অন্য কোথাও গিয়ে বলো।'

'রবিন ঠিকই বলেছে,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'আরেকটু হলেই আমার কোমর ভেঙে দিয়েছিল।'

চকিতে চিন্তার ছাপ খেলে গেল জেসিকার চেহারায়, এবার তিনি বললেন, 'সত্যিই যদি কোনও কিছু ঘটে থাকে তো সে-ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে ব্যস্ত ছিলাম।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'চলো, দেখা যাক কী ঘটেছে।'

অফিস ছেড়ে দুর্ঘটনার জায়গায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এলেন তিনি। ধসে পড়া বস্তার স্তূপ দেখে বললেন, 'বাড়িয়ে বলেছ তোমরা। কে তোমাদের খুন করতে চাইবে! বস্তাগুলো বড় বেশি উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, পড়ে গেছে।'

'কয়জন ক্লার্ক আছে আপনাদের সেল্‌স্‌ ফ্লোরে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

'ছয়জন। ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো। আমি অফিসে যাচ্ছি।' পা বাড়িয়েও থেমে দাঁড়ালেন জেসিকা স্প্রিংগার। ঘাড় ফিরিয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন। 'তোমরা নিক মিলহিজারকে খুঁজছিলে। ওই যে মিলহিজার।' পুরু কাঁচের জানালার ওপাশে একজনকে হাত তুলে দেখালেন তিনি।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ওরা। পেট প্রভিশন কোম্পানির একটা ভ্যান থেকে নামছে সোনালী চুলের এক চিকন-চাকন যুবক।

'আমরা তা হলে আসি,' বিদায় নিল কিশোর জেসিকা স্প্রিংগারের কাছ থেকে, বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো, ভদ্রলোকের সঙ্গে বাইরেই কথা বলি।'

অটোমেটিক দরজার ইলেকট্রনিক ফিল্ডের ভিতর যেতেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে খুলে গেল দোকানের দরজাটা। বেরিয়ে এলো ওরা। 'মিস্টার

মিলহিজার!' ডাকল কিশোর।

ভ্যান মাত্র লক করেছে নিক মিলহিজার, ওদের দিকে ফিরে তাকাল। তিন কিশোরকে দেখে তার চেহারায় কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠল।

'কী ব্যাপার?'

তার সামনে গিয়ে থামল তিন গোয়েন্দা, সময় নষ্ট না করে কিশোর বলল, 'আমরা শুনেছি আপনি ডগ-হাউসে চাকরি করতেন।' নিজেদের পরিচয় দিল ও।

'ঠিকই শুনেছ,' গম্ভীর হয়ে গেল নিক মিলহিজারের চেহারা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'চাকরিটা ছাড়লেন কেন?'

'লেবউফ যেসব কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিল তা আমার পছন্দ হয়নি। আমি রেজিস্টার্ড অ্যানিমেল টেকনিশিয়ান। তার মানে বোঝো? ভেটেরিনারিয়ানের সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা আছে আমার। বলতে পারো পশুর নার্স। আর লেবউফ আমাকে বলেছিল কুকুরের গু পরিষ্কার করতে!'

'তারপর থেকে এখানে কাজ করছেন?' জানতে চাইল মুসা।

'হয়তো মনে হতে পারে কাজটা তেমন কিছু নয়,' খানিকটা কৈফিয়তের সুরেই বলল মিলহিজার। 'কিন্তু এখানে আমাকে অন্তত অপমান করা হয় না। তা ছাড়া, এখানে দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল কিশোর। 'দায়িত্ব বলতে কী বোঝাচ্ছেন?'

'পশুরা কী খাবে আর কখন খাবে সেটা আমিই ঠিক করি।'

'ডগ-হাউসে তা করতেন না?'

'না।' ক্ষণিকের জন্য অপ্রস্তুত দেখাল মিলহিজারকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এতো সব প্রশ্ন করছ কেন?'

'মিস্টার রকফেলারের কোলি কুকুরটা ডগ-হাউস থেকে চুরি গেছে,' বলল কিশোর। 'আমরা সেই কুকুর-চোরকে খুঁজছি। সে-কারণেই আপনাকে প্রশ্ন করা।'

'কুকুরচুরির খবরটা পেপারে পড়েছি। কুকুরের জন্য তো মুক্তিপণ পর্যন্ত চেয়েছে। কালে কতোকিছু যে দেখব!' কিশোরের চোখে তাকাল

মিলহিজার। 'তা আমাকে চোর ভাবছ না কি!'

'অবশ্যই না,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'তদন্তের খাতিরে অনেককেই অনেক কথা জিজ্ঞেসা করছি আমরা।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'আপনি যখন ডগ-হাউসে ছিলেন তখন তো আপনার কাছে ওখানকার চাবি ছিল। সেই চাবি কি আপনি জমা দিয়েছিলেন চাকরি ছাড়ার সময়?'

'নিশ্চয়ই! লেবউফের সামনে চাবিটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসি আমি।'

'মিস জেসিকা বললেন আপনি ডেলিভারি দিতে গিয়েছিলেন,' বলল মুসা। 'অ্যানিমেল টেকনিশিয়ানরা কি সাধারণত এধরনের কাজ করে থাকে?'

মৃদু হাসল মিলহিজার। 'না, তা করে না। তবে জেসিকা ম্যানেজার হওয়ার চেষ্টা করছে। সে-কারণেই আমার সাহায্য করা। ওর সাফল্য মানে আমারও সাফল্য।'

'আর একটা প্রশ্ন,' বলল কিশোর। 'আপনি কি এইমাত্র দোকানে ফিরেছেন?'

'নিশ্চয়ই! কেন?'

'না, এমনি।' তদন্তে সহায়তা করার জন্য নিক মিলহিজারকে ধন্যবাদ দিল কিশোর, তারপর বলল, 'দরকার পড়লে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই!' হাত নেড়ে দোকানের দিকে পা বাড়াল নিক মিলহিজার।

গাড়িতে উঠে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, জিজ্ঞেস করল, 'জেসিকা স্প্রিংগারের অফিসে অস্বাভাবিক কিছু তোমাদের চোখে পড়েছে?'

'না তো,' এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।

'অস্বাভাবিক কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না,' বলল রবিন।

'জানোয়ার রাখার বড় বড় কয়েকটা প্ল্যাস্টিকের খাঁচা দেখোনি?'

'ওই দোকান তো জন্তু-জানোয়ার বিক্রিও করে,' বলল মুসা। 'নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে খাঁচাও বিক্রি করে। এক জায়গায় অনেকগুলো দেখেছি ওই জিনিস। কোনও কোনওটা তো এতো বড় যে সেইন্ট বার্নার্ড

কুকুরও রাখা যাবে।'

'মিস জেসিকার অফিসে যেগুলো ছিল সেগুলো ব্যবহৃত। ওগুলোর একটা কোলি কুকুরটা রাখার মতো বড়।'

'কিন্তু মিস জেসিকা তো বলেছেন তাঁরা শুধু বাচ্চা কুকুর বিক্রি করেন!' চট করে তথ্যটা নোটবুকে টুকল রবিন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে বড় কুকুরের খাঁচা কীসের জন্য? আরও একটা ব্যাপার, ফাইল নিয়ে ওরকম গোপনীয়তাই বা কীসের? ফাইলে কী আছে যে তিনি ওগুলো আমাদের দেখাতে চাননি?'

'জানতে হবে সেটা,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'আজ রাতেই জানব। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আসব আবার। ততোক্ষণে দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানে ঢোকার চেষ্টা করব। পেছন দিকের কয়েকটা জানালা খোলা দেখেছি, গ্রিল নেই। একটা জানালাও যদি খোলা থাকে, তা হলে কাজটা সহজই হবে। হয়তো মিস জেসিকার অফিসের ওই ফাইলগুলোর একটায় কোলি সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যেতেও পারে।'

'আমি বাদ,' বলল মুসা। 'কোমরটা একেবারে গেছে। ব্যথায় নড়তে কষ্ট হচ্ছে। রাতের খাবারের পর ব্যথার ট্যাবলেট খেয়ে সোজা ঘুম দেব আমি।'

'রবিন?' নথির দিকে তাকাল কিশোর।

'চলে আসব,' বলল রবিন। 'তোমার বাসায় রাত কাটাব বললে মা আপত্তি করবে না।'

'তা হলে এই কথাই রইল,' সিটে হেলান দিয়ে বসল কিশোর।

রবিনকে আগে বাড়িতে নামিয়ে দিল মুসা, তারপর কিশোরকে স্যালভিজ ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

সে-রাতে আটটার সময় পেট সুপারস্টোরের উল্টোদিকে পার্কিং লটে থামল একটা ফোক্সওয়াগেন গাড়ি। এটা মুসারটার মতো অতোটা তোবড়ানো নয়, রঙও আলাদা। নামল কিশোর আর রবিন। রবিন গাড়ি লক করার পর কিশোর বলল, 'চলো, আগে পেছন দিকের জানালাগুলো

খোলা আছে কি না দেখি।'

কপাল ভাল ওদের, একটা জানালা অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। জানালা বন্ধ করা যার দায়িত্ব সে একটু বেখেয়াল।

'উঠব কীভাবে?' উঁচু জানালাটার দিকে তাকাল রবিন।

'আমি বসছি,' বলল কিশোর। 'তুমি আমার পিঠের ওপর উঠে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ো। পরে আমাকে টেনে তুলবে।'

'ধরা পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

'জানি। ঝুঁকি তো কিছু নিতেই হবে। পিঠ টনটন করছে, শীঘ্রি জানালা খোলো।'

জানালা সামান্য ফাঁক হয়ে থাকলেও ছিটকিনি ঠিকই আটকানো আছে। পাঁচ মিনিট কসরত করে ওটা খুলতে পারল রবিন। ততোক্ষণে, কিশোরের মনে হলো রবিনের ওজন শনৈঃ শনৈঃ বাড়ছে।

রবিন একবার ঢুকে পড়ার পর কিশোরের ঢুকতে তেমন কোনও অসুবিধে হলো না। হাত ধরে খানিকটা তুলল ওকে রবিন, বাকিটা দেয়ালে পা বাধিয়ে কিশোরই পারল।

পেটশপে কোনও সিকিউরিটি সিস্টেম নেই। হয়তো ভাবা হয়েছে জন্তু-জানোয়ারের দোকানে চোর ঢুকবে না।

টর্চ জ্বেলে দেখল একটা স্টোররুমের ভিতর আছে ওরা। গুদামের দরজাটা ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে, ওটা ঠেলে মূল দোকানের ভিতর ঢুকল দু'জন, চলে এলো মালপত্র বিক্রি করার কাউন্টারগুলোর কাছে। পড়ে যাওয়া বস্তাগুলোকে আবার তুলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কাজটা নিক মিলহিজারকেই করতে হয়েছে কি না ভাবল কিশোর। বস্তা ফেলার পিছনে সে-ও থাকতে পারে, কথাটা মন থেকে মুছে ফেলল না। গোয়েন্দাদের কোনও সম্ভাবনাই বাদ দিতে নেই।

দোকানের পিছনে অফিসগুলোর কাছে চলে এলো ওরা।

'তুমি অন্য অফিসগুলোয় ঢুঁ মারো,' রবিনকে বলল কিশোর। 'আমি যাচ্ছি মিস জেসিকার অফিসের ফাইলগুলো দেখতে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের একটা অফিসে ঢুকল রবিন। কিশোর ঢুকে পড়ল মিস জেসিকার অফিসে। টর্চের আলোয় দেখল,

ডেস্কটা খুব অগোছাল হয়ে আছে। আগেরবারও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কিশোর। মহিলা গোছানো স্বভাবের নন।

একটা একটা করে কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল ও। ইনভয়েস, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের খসড়া, আর চাকরিপ্রার্থীদের দরখাস্ত। ডেস্কের ডানদিকের ড্রয়ার ঘেঁটে কর্মচারীদের একটা ফাইল পেল। ওটাতে নিক মিলহিজারের দরখাস্ত দেখে পড়তে শুরু করল কিশোর গভীর মনোযোগে।

ওদিকে রবিন একটা অফিসে ঢুকে উল্লেখযোগ্য কিছু না দেখে বেরিয়ে এলো। এবার চলল দোকানের আরেক দিকে। ওর উদ্দেশ্য ফর্কলিফটটা দেখা। সম্ভবত ওটার গায়ে আঙুলের ছাপের কোনও অভাব নেই। তবে তাতে কোনও কাজ হবে না। বস্তা পড়ার পর জিনিসটা আবার সরিয়ে রাখা হয়েছে। দোকানের কর্মচারীদের আঙুলের ছাপ পেলেও কিছু প্রমাণ করা যাবে না।

চট করে টর্চ নিভিয়ে ফেলল রবিন। ওর মনে হয়েছে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। কিশোর নাকি? ডাকা ঠিক হবে না। যদি অন্য কেউ হয়? চোর? খানিক অপেক্ষা করে টর্চটা আবার জ্বালতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। আবার আওয়াজটা হয়েছে। জেসিকা স্প্রিংগারের অফিসের পাশের একটা অফিস থেকে শব্দটা আসছে বলে মনে হলো।

নিঃশব্দে সেদিকে এগোল রবিন। খেয়াল করল, দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

কান পাতল কাছাকাছি গিয়ে। না, কোনও আওয়াজ নেই। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলল ও। টর্চ জ্বেলে অফিসের ভিতরে আলো ফেলল। এটা একটা সাপ্লাই রুম। মেঝে পরিষ্কার করার সাবান আর মোমের পিপে দেখতে পেল। ভিতরে ঢুকল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ভুল করে ফেলেছে। দরজার পাল্লার আড়াল থেকে একটা ছায়া বের হতে দেখল ও চোখের কোণে। নড়ার আগেই একটা ঝাড়ুর হাতল সজোরে নেমে এলো ওর মাথার তালুতে। খুব জোরে লাগল আঘাতটা।

জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল রবিন।

এদিকে এখনও জেসিকা স্প্রিংগারের ফাইল ঘাঁটছে কিশোর। নিক মিলহিজারের দরখাস্ত ছাড়া ওদের তদন্তের জন্য জরুরি আর কিছু এখনও পায়নি ও। কুকুর যেগুলো বিক্রি হয়েছে সবগুলো বাচ্চা। কোথাও কোলির কোনও উল্লেখ নেই। রকি বিচ ব্যানার পত্রিকার একটা কাটিং দেখতে পেল। ওটাতে লেখা: সত্যিই কি কুকুরদের জন্য মোটেল চালু হবে?

আর্টিকেলে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে কারিনা মুরের কথা। কীভাবে তিনি কোর্টে লড়েছেন তা জানা যাবে আর্টিকেলটা পড়লে। শেষদিকটা পড়ল কিশোর। ওখানে লেখা: ডগ-হাউসের শেষ দেখে ছাড়বেন বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কারিনা মুর।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল কিশোরের। এটা সংগ্রহে রেখেছেন কেন জেসিকা স্প্রিংগার? কতোটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কারিনা মুর? তিনি কি ডগ-হাউস বন্ধ করতে বেআইনী কিছুও করতে পারেন?

কয়েকটা হ্যান্ডবিল নজর কাড়ল ওর। পেট সুপারস্টোর জন্তু-জানোয়ারদের একটা শো করবে। মালিকদের খাঁচায় করে তাদের পোষা প্রাণী আনতে বলা হয়েছে। তাদের যদি খাঁচা না থাকে, তা হলে দোকান থেকে খাঁচা সরবরাহ করা হবে। একারণেই হয়তো মিস জেসিকার অফিসে এই ব্যবহৃত খাঁচাগুলো রাখা আছে, ভাবল কিশোর।

কাগজপত্র আগের মতো রাখতে রাখতে একটা আওয়াজ শুনতে পেল ও। কাজ থামাল না কিশোর। ধরেই নিয়েছে আওয়াজটা রবিন করেছে।

মাথার উপর আঘাতটা এলো হঠাৎ করেই। মেঝেতে পড়ে যেতে যেতে জ্ঞান হারানোর আগে ওর শেষ চিন্তা হলো: *আওয়াজটা তা হলে রবিনের নয়!*

অন্তত ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরল ওর। মাথার ব্যথায় কপাল কুঁচকে উঠল। উঠে বসতে চেষ্টা করল কিশোর। মাথায় কিসের যেন বাধা পেল। নতুন করে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল কিশোর। কোথায়

আছে ও? ছাদটা এতো নীচে নেমে এলো কী করে?

আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো ওর। আগের চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছে এখন। যা দেখল তাতে অবাক না হয়ে পারল না। স্টিলের গরাদগুলো খুব কাছাকাছি বসানো। খাঁচার ভিতর বন্দি করা হয়েছে ওকে? কিশোর ডাকল, 'রবিন?'

জবাব এলো না কোনও। চারপাশে বিরাজ করছে কবরের নীরবতা।

মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। নড়তে চেষ্টা করল না আর কিশোর। খুব অসুবিধেজনক অবস্থায় আছে ও। জায়গার অভাবে হাঁটু দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। বুঝতে পারছে দাঁড়ানোর উপায় নেই। অন্ধকারে চোখ আরও সয়ে আসার পর বুঝতে পারল, একটা বাক্সের ভিতর আছে ও। দরজাটা তালা মারা। দু'পাশে ছোট ছোট দুটো জানালা আছে, ওগুলোতেও স্টিলের গরাদ দেওয়া। এবার কিশোর নিশ্চিত ভাবেই বুঝতে পারল কোথায় আছে। ডোবারম্যান বা জার্মান শেফার্ড রাখা যাবে এমন একটা খাঁচায় ওকে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়েছে কেউ!

সাত

দরজায় ধাক্কা দিল কিশোর। ঝনঝন করে আওয়াজ হলো, তবে দরজার তালা এভাবে খোলা যাবে না।

'কিশোর, তুমি?' দুর্বল একটা কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল।

কাছেই আছে রবিন। খুব কাছাকাছি কোথাও। কোথায়? 'রবিন তুমি কোথায়?'

'আমি তোমার প্রতিবেশী,' জবাব দিল রবিন।

মাথা বাঁচিয়ে সাবধানে একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পাশের খাঁচার জানালায় রবিনের মুখ দেখতে পেল। ওকেও খাঁচার ভিতর পুরে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে!

'কাজটা কার দেখতে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবিন। 'পেছন থেকে আঘাত করেছিল।'

'আমাকেও,' বলল কিশোর। 'কেউ একজন আমাদের আগে আগে চলছে। আমরা যা করছি সবই সে আগে থেকে আন্দাজ করতে পারছে।'

'মুসা থাকলে বলত এসব ভূতের কাণ্ড,' বিড়বিড় করল রবিন। 'তিনটা কুকুর চুরি করেছে বলে এতো ঝুঁকি নিচ্ছে কেন লোকটা? জানছেই বা কীভাবে যে আমরা কখন কোথায় যাব?'

প্রসঙ্গ পাল্টাল কিশোর। 'আমি নিক মিলহিজারের চাকরির দরখাস্তটা পড়েছি। লোকটা বন্দরের কাছেই থাকে। ওয়্যারহাউস থেকে জায়গাটা সামান্য দূরে।'

'পুলিশকে জানালে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'হলদে দরজাওয়ালা গাড়ির মালিককে পুলিশ ধরলেই সব রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।'

'পুলিশকে যে জানাব, বের হতে হবে না এখান থেকে? তা ছাড়া, কোনও প্রমাণ ছাড়া পুলিশের কাছে যাবই বা কীভাবে? যা করার আমাদেরই করতে হবে। আগের কাজ আগে। প্রথমে এখান থেকে বের হতে হবে।'

'কীভাবে?'

ওর বন্দিশালা ভাল করে দেখল কিশোর। খাঁচাটা দুটো প্ল্যাস্টিকের অংশ দিয়ে তৈরি। নীচের অর্ধেক আর উপরের অর্ধেক জোড়া দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট কয়েকটা বল্টু দিয়ে। ওগুলো আছে বাইরের দিকে দু'পাশে দুটো কার্নিশের গায়ে।

'গায়ের জোর খাটাতে হবে,' বলল কিশোর। 'এগুলো প্ল্যাস্টিকের তৈরি। নতুন গার্বেজ ক্যানগুলোর মতো।' একদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দু'পা এক করে জানালায় গায়ের জোরে ঠেলা দিল ও। বেঁকে গেল জানালার শিকগুলো। এবার পা সরিয়ে এনে ওগুলোর উপর লাথি মারতে শুরু করল কিশোর।

একের পর এক লাথি মারছে ও। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে জানালার গরাদে। চারবার লাথি মারতেই ওর পা ভাঙা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। গরাদগুলো ফ্রেমসহ ছিটকে কংক্রিটের মেঝেতে

পড়ে পিছলে দূরে সরল।

দেরি না করে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে দিল কিশোর, ওর আঙুল প্রথম বল্টুটাকে খুঁজে নিল। শক্ত করে আটকানো আছে বল্টু, কিন্তু কয়েক মিনিট একটানা চেষ্টার পর ঘুরতে শুরু করল। আরও আধমিনিট পর খুট করে মেঝেতে পড়ল ওটা।

'কাজ হচ্ছে?' ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সময় লাগবে,' জানাল কিশোর। পরক্ষণেই প্রশ্ন করল, 'তুমি চুপচাপ বসে আছো কেন?'

'আগে দেখি তুমি পারো কি না, তারপর চেষ্টা করব,' বলল রবিন। 'মাথার ব্যথাটা ভোগাচ্ছে।'

আবার কাজে লেগে পড়ল কিশোর। দ্বিতীয় বল্টুটা খোলা সহজই হলো। তিন নম্বরটা শক্ত ছিল, কিন্তু মিনিট চারেক ওটার পিছনে লেগে থেকে ওটাও খুলতে পারল ও। এদিকের বল্টু সবগুলোই খসে গেছে। এবার হাঁটুতে ভর দিয়ে পিঠ উঁচু করল কিশোর। ছাদে পিঠ ঠেকতেই দাঁতে দাঁত চেপে উপর দিকে ঠেলা দিল। যেদিকের বল্টু খুলেছে সেদিকেই চাপটা বেশি দিচ্ছে।

'ছাদ খসে আসছে,' শ্বাসের ফাঁকে বলল কিশোর। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ঠেলা দিল। প্ল্যাস্টিক বেঁকে যাচ্ছে, তারপর বল্টুগুলো থেকে উপড়ে বেরিয়ে এলো ওদিকের উপরের কার্নিশ। ছাদটা খসে যেতেই চারপাশের দেয়াল টপকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর, রবিনের খাঁচার বল্টু খুলতে তিন মিনিটও লাগল না। রবিন বের হতেই ও জিজ্ঞেস করল, 'এখন মাথার কী অবস্থা?'

'ঘেউ!' জবাব দিল রবিন, তারপর বলল, 'আগের চেয়ে ভাল।'

'সত্যি, কুকুরের খাঁচায় বন্দি হওয়াটা অত্যন্ত অপমানজনক,' মন্তব্য করল কিশোর।

'তুমি যদি কাউকে না বলো, তা হলে আমিও কাউকে বলব না,' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'মুসাকেও না।'

'এমন কী ঘটেছে যে বলতে হবে,' মুচকি হাসল কিশোর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাড়ে ন'টা বাজে। দেরি হয়ে গেছে, তবু চলো

একবার নিক মিলহিজারের বাসায় ঢুঁ মেরে আসি।'

ওয়াটার স্ট্রিট ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল রবিনের ফোক্সওয়াগেন। গাড়ি চালানোর ফাঁকে ও বলল, 'ঠিকানাটা বামদিকের কোনও বাড়ির। সেভেন-এইটি-ওয়ান।' হাত তুলে পুরোনো একটা রংচটা বাড়ি দেখাল রবিন। 'ওই যে, ওই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটাই হবে।'

'অ্যাপার্টমেন্ট নম্বরটা লিখে নিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চার দিয়ে কী যেন, লিখিনি,' বলল রবিন। 'খুঁজে বের করতে হবে।'

বাড়িটার সামনে গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা। অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলছে।

'মেইলবক্সে মিলহিজারের নাম থাকতে পারে,' মন্তব্য করল কিশোর।'

সদর দরজা খোলাই আছে, ভিতরে ঢুকল ওরা। একদিকের দেয়ালে মেইলবক্সের সারি। ওখানে গিয়ে নামগুলো পড়তে শুরু করল ওরা। বেশিরভাগ মেইলবক্সের গায়েই কোনও নাম নেই। কয়েকটায় টাইপ করা নাম আছে, বাকি কয়েকটায় পেন্সিল দিয়ে নাম লেখা।

'চারতলায় চারটে অ্যাপার্টমেন্ট আছে,' বলল কিশোর। 'একটা মেইলবক্সেও নিক মিলহিজারের নাম লেখা নেই।'

'এটাতে লেখা আছে মন্টোগোমারি,' বলল রবিন।

'তার মানে ফোর-সি বাদ।' মেইলবক্সের সারির পাশে বুলেটিন বোর্ডে চোখ বুলাল কিশোর। 'বাড়ির মালিকের তরফ থেকে একটা নোটিশ আছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ফোর-ডি খালি পড়ে আছে, ভাড়াটে চায়।'

'তা হলে বাকি রইল ফোর-বি আর ফোর-এ,' বলল রবিন। 'চলো, গিয়ে নক করে দেখি।'

সিঁড়ির খোঁজে এগিয়ে গেল ওরা। সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা আছে। ওটা বন্ধ। ধাক্কা দেওয়ার পরও খুলল না।

'দরজায় সিকিউরিটি সিস্টেম আছে,' বলল কিশোর। 'ইন্টারকমে চারতলার অ্যাপার্টমেন্ট দুটোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।'

'এক্সকিউয মি,' ওদের পিছন থেকে বললেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এই মাত্র ফয়ারে ঢুকেছেন তিনি। ওরা সরে দাঁড়াতেই তালা দিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন।

'ইন্টারকমের আর দরকার পড়ল না,' দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই খপ করে ধরল কিশোর।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে উঠছে ওরা, চারপাশ থেকে টেলিভিশন, বাচ্চার কান্না আর মহিলাদের ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেল। চারতলার ল্যান্ডিঙে বাতি নষ্ট, ফলে অন্ধকার। যে-অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া হবে সেটার দরজায় ঝুলছে একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, ওটার ভিতর আগের ভাড়াটের কাছে আসা চিঠিপত্র।

'ফোর-এ'র ভাড়াটে জেগে আছে,' বলল কিশোর। অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর থেকে এতো জোরে ডেকসেট বাজার আওয়াজ আসছে যে গলা চড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে ওকে।

কলিং বেল খুঁজে না পেয়ে দরজায় জোরে জোরে থাবড়া দিল কিশোর। বেশ কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, 'ইয়াহ্? কী চাই?'

রবিনের দিকে এক পলক তাকাল কিশোর, তারপর চেঁচাল, 'বিগ ব্রাদার পেস্ট কন্ট্রোল। মিস্টার মিলহিজার আমাদের ডেকেছেন।'

'পেস্ট কন্ট্রোল?' মোটা গলাটা প্রায় খেঁকিয়ে উঠল। 'এতো রাতে কী?'

'পোকামাকড় সহজে বিশ্রাম নেয় না,' জবাব দিল কিশোর। 'সে-কারণে আমরাও বিশ্রাম নিই না।'

'আমি ডাকিনি,' ঘোঁৎ করে উঠল পুরুষ কণ্ঠ।

'এটা কি ফোর-এ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এবার মহা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলল ভাড়াটে। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে লোকটার। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা প্যান্ট আর কোঁচকানো গেঞ্জি পরে আছে।

কিশোর-রবিনকে পালা করে দেখল সে। 'কে তোমাদের ডেকেছে বললে যেন?'

রবিন পকেট থেকে নোট বুক বের করে একটা খালি পাতায় চোখ বুলাল। 'মিস্টার নিক মিলহিজার।'

'ওই নামে এখানে কেউ নেই।'

'আমরা বোধহয় অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ভুল লিখেছি,' বলল কিশোর। 'বোধহয় উল্টোদিকের কোনও অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন উনি। চিনবেন ওঁকে আপনি। বয়সে যুবক। চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা।'

'চিনি বলেই তো মনে হচ্ছে,' বলল কোঁচকানো গেঞ্জি। 'কিন্তু যতোদূর জানি আজ বিকেলেই সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। নানারকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম, বেরিয়ে দেখি বাক্সপ্যাটরা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।'

'তাঁর নাম কি নিক মিলহিজার?'

'আমাকে দেখে কি এ-বাড়ির কেয়ারটেকার মনে হয় না কি!' চোখ সরু করে কিশোরকে দেখল ময়লা প্যান্ট। 'জানি না তার নাম কী। জানতে চাইও না।'

'মিস্টার মিলহিজারের কি কোনও কুকুর আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। সহজে দমে যেতে রাজি নয় ও।

'এই বাড়িতে কোনও কুকুর রাখার অনুমতি নেই।'

'কোনও রুমমেট ছিল?'

'আর কোনও কথা বলতে চাই না,' বলল লোকটা। 'গুড নাইট!'

'বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত,' বলল রবিন। ওর মুখের উপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

'অত্যন্ত ভদ্রলোক,' শুকনো গলায় বলল কিশোর। করিডরের উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার দিকে তাকাল ও। দরজাটা দাগে ভরা। ছোট একটা পেরেকে ফোর-বি লেখা কাগজ ঝুলছে।

ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ওর পাশেই রবিন। দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে।

'খোলা,' বলল কিশোর।

আস্তে করে ঠেলা দিল রবিন, আরও কয়েক ইঞ্চি খুলে গেল দরজা। ভিতরে উঁকি দিল ওরা। সামনের ঘরে একটা আসবাবপত্রও নেই। কেউ

থাকে বলে মনে হলো না।

দমকা বাতাসে হঠাৎ অনেকখানি খুলে গেল দরজা। রবিন আর কিশোর একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ঘরের ভিতর। বেসবল ক্যাপ পরে আছে, এতো নিচু করে টেনে পরেছে যে, ক্যাপের বেড়ে থাকা সামনের অংশের কারণে তার চেহারা দেখা গেল না।

'মিস্টার মিলহিজার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

যদি লোকটা নিক মিলহিজারও হয়ে থাকে, কোনও জবাব দিল না সে। তার বদলে, ছোট একটা ক্যান তুলে ধরল সে, তারপর রবিন-কিশোর কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের চোখে-মুখে স্প্রে করল সে ওটা থেকে। হিসহিস আওয়াজ করে বাষ্পের মতো তরল ছিটে এসে লাগল ওদের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে চলে গেল দুই গোয়েন্দার হাত। জিনিসটা যা-ই হোক, অসম্ভব জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে ওদের চোখে। চোখ ডলতে শুরু করল ওরা। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না!

ধাক্কা দিয়ে কিশোর-রবিনকে সরিয়ে দেওয়া হলো, পায়ের আওয়াজ পেল ওরা। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা। সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেল, দ্রুত নেমে যাচ্ছে আক্রমণকারী।

চোখ মেলতে চেষ্টা করল কিশোর। কষ্ট হলো, তবে পারল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। চরম আতঙ্কের একটা স্রোত নেমে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। ও কি অন্ধ হয়ে গেল?

'কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল রবিন।

আট

'আমিও না,' বিড়বিড় করল কিশোর। আতঙ্ক সামলে নিতে চেষ্টা করে বলল, 'বোধহয় আমাদের চোখে মরিচের গ্যাস ছুঁড়ে চলে গেছে লোকটা। চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবার আগেই চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে।'

'অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা বন্ধ করেনি,' বলল রবিন। 'ভেতরে পানি পাওয়া যাবে হয়তো।'

হাতড়ে হাতড়ে দরজায় ধাক্কা খেয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। 'তুমি বামদিকের দেয়াল ধরে ধরে যাও,' বলল কিশোর। 'আমি ডানদিকের দেয়াল ধরে যাচ্ছি। যে আগে কিচেন বা টয়লেট পাবে সে জানাবে।'

'ঠিক আছে।' দেয়ালে রবিনের হাত ঘষা খাওয়ার আওয়াজ পেল কিশোর। নিজেও রওনা হয়ে গেল ও।

তিন মিনিট পর রবিনের ডাক শুনতে পেল কিশোর। 'বেসিন পেয়েছি। আমি কথা বলছি, তুমি আওয়াজ অনুসরণ করে এসো।'

পানি পড়ার শব্দ পেল কিশোর। আস্তে আস্তে ওদিকে এগোল। 'কোনও আসবাবপত্র দেখিনি, কাজেই হোঁচট খাবে না কিছুতে,' বলল রবিন। 'পানিতে কাজ হচ্ছে, অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি এখন।'

বুকের ভিতর স্বস্তির একটা ঢেউ অনুভব করল কিশোর। তা হলে মরিচের গ্যাসই, ক্ষতিকর অন্য কিছু নয়!

বেসিনের কাছে পৌঁছে গেল ও। ওর হাত ধরে জায়গামতো দাঁড় করিয়ে দিল রবিন। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিতে শুরু করল কিশোর। মিনিটখানেক পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল আবার। প্রথমেই রবিন জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে তা চিনতে পেরেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, চোখে পানির ছিটা দিল। 'শুধু ক্যাপটা দেখতে পেয়েছি। মুখটা ছায়ার মধ্যে ছিল। তুমি চিনতে পেরেছ?'

'আমি শুধু দেখেছি তার অ্যারোসোল স্প্রে ক্যান,' বলল রবিন। বিরক্তি ভরে মাথা নাড়ল। 'বারবার আমাদের বোকা বানাচ্ছে লোকটা। আমরা গোয়েন্দা, আমরা তার পেছনে লাগব কী, সে-ই সর্বক্ষণ আমাদের পেছনে লেগে আছে।'

'ঠিকই ওকে ধরে ফেলব আমরা,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। 'আগে এসো, অ্যাপার্টমেন্টটা সার্চ করে দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।'

বেডরুম আর ক্লজিটগুলো খুঁজে দেখতে শুরু করল কিশোর, রবিন গেল লিভিংরুম আর কিচেনে। ভাড়াটে সবকিছু পরিষ্কার করে রেখে

যায়নি বটে, তবে কোনও সূত্রও পাওয়া গেল না।

'কিছু নেই,' শেষপর্যন্ত বলল কিশোর। 'কুকুর ছিল তারও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। ভাড়াটের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। 'আমাদের মোবাইল হোমের ফোনের আনসারিং মেশিনে হয়তো ওয়্যারহাউসটার মালিক সম্পর্কে কোনও খবর থাকতে পারে। মিস্টার বার্লিসন হয়তো ফোন করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, চলো, যাওয়া যাক।' দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠল ওরা, ফিরে চলল স্যালভিজ ইয়ার্ডের উদ্দেশে। ইয়ার্ডে পৌঁছে আগে চাচীকে জানাল ওরা ফিরেছে, তারপর মোবাইল হোমে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আনসারিং মেশিনে সত্যিই খবর পাওয়া গেল। মিস্টার বার্লিসন জানিয়েছেন তাঁদের অফিসের কম্পিউটার এখনও ঠিক হয়নি, হলেই ওয়্যারহাউসের মালিক কে সেটা তিনি জেনে নিয়ে জানাবেন।

'আজ রাতে আর কিছু করার নেই,' হতাশ হয়ে বলল রবিন। 'চলো, ঘুমিয়ে পড়ি গিয়ে। কাল সকাল থেকে আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করা যাবে।'

'হ্যাঁ, চলো,' সায় দিল কিশোর।

মোবাইল হোম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। কিশোরের ঘরে চলে এলো। কাপড় পাল্টে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের।

পরদিন সকাল সকাল মুসা এসে হাজির হলো।

ওকে বসে পড়তে বলে ওর জন্য আরও কয়েকটা পাউরুটি চড়ালেন চাচি টোস্টারে। একসঙ্গে নাস্তা সারল ওরা, খাওয়ার ফাঁকে রবিন আর কিশোর মুসাকে জানাল কাল রাতে কী ঘটেছে; সযত্নে চেপে গেল কুকুরের খাঁচায় বন্দি হওয়ার কথাটা, তারপর চলে এলো মোবাইল হোমে।

মোবাইল হোমে ঢুকেই মুসা বলল, 'এবার বলে ফেলো, রবিন, ঠিক কী ঘটেছিল। দোকানের ভেতরে ঢোকার কথা বলার পরপরই তোমার

মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যেতে দেখেছি আমি নাস্তা খাবার সময়। কিছু একটা গোপন করছ তোমরা দু'জন। সকালের পেপারে পড়লাম পেট সুপারস্টোরে চোর ঢুকেছিল। কিছু চুরি করেনি। কিন্তু দুটো খাঁচা নষ্ট করে দিয়ে গেছে।'

কিশোর হাসি চাপল। 'আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, পেট শপে ঢোকার পর একসময় নিজেকে রবিনের খাঁচায় বন্দি পশু বলে মনে হচ্ছিল।'

আর চেপে রাখতে পারল না রবিন, খুলে বলল কীভাবে ওদের বোকা বানিয়ে কুকুরের খাঁচায় ভরে রেখে গিয়েছিল কুকুর- চোর লোকটা।

'এবার তদন্তের কাজ,' গম্ভীর কিশোর। ভাব দেখে মনে হলো ওকে কেউ কুকুরের খাঁচায় বন্দি করেনি। 'আগে ফোন করতে হবে পুলিশ চিফের কাছে।' পুলিশ স্টেশনের নাম্বারে ডায়াল করল ও। অফিসেই পাওয়া গেল চিফ ইয়ান ফ্লেচারকে। সাধারণ দু'একটা কথার পর কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কুকুর চুরি রহস্যের ব্যাপারে তদন্ত এগোল, সার?'

'নাহ্,' হতাশ শোনাল চিফের কণ্ঠ। একটু থেমে বললেন, 'কুকুর চুরি বলেই অফিসারদের কেউ তেমন গা করছে না। গুরুত্ব দিচ্ছে না কেউ ব্যাপারটাকে। ঢিলেঢালা ভাবে তদন্ত চলছে, হাতে সূত্র বলতে কিছুই নেই। ...তোমাদের কী অবস্থা?'

'কুকুর-চোর আমাদের কাছ থেকে রাফিয়ানকে চুরি করে নিয়ে গেছে,' জানাল কিশোর। 'আমাদের হাতেও জোরাল কোনও সূত্র নেই, তবে হাল ছেড়ে দিচ্ছি না আমরা। ...আর কোনও কুকুর চুরি গেছে, সার?'

'গেছে। তোমাদের কাছে ই-মেইল করছি। রিপোর্টটা পড়ে নিয়ো।'

'অনেক ধন্যবাদ, সার।'

হাসলেন ইয়ান ফ্লেচার, ফোন রাখার আগে বললেন, 'বেস্ট অভ লাক।'

কম্পিউটার প্রিন্টার চালু করে তিনটে কাগজের শিট বের করল

কিশোর।

পুলিশ চিফ ইয়ান ফ্লেচার ইন্টারনেটে তিন পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ওদের জন্য, সেটায় চোখ বুলাল ওরা।

রকি বিচের বিভিন্ন অভিজাত এলাকা থেকে বড়লোকদের আরও দুটো কুকুর চুরি গেছে। সেই সঙ্গে চুরি হয়েছে মধ্যবিত্তদের কয়েকটা নেড়ি কুত্তাও। পুলিশ এখনও কেসটায় তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবে রকফেলারের কারণে উপরমহলের চাপ আসতে শুরু করেছে।

'কী বুঝব এ থেকে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'পয়সাওয়ালাদের কুকুরগুলো না হয় নিয়েছে মুক্তিপণের আশায়, কিন্তু নেড়ি কুকুর দিয়ে কী করবে সে?'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'মনে হচ্ছে লোকটার টাকার খুব দরকার। কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক নয় সে। নইলে কুকুরের বদলে মানুষের বাচ্চাই চুরি করত। ধরা পড়লে যাতে কম শাস্তি হয় সেদিকে লোকটার খেয়াল আছে। পয়সাওয়ালাদের কুকুর নিচ্ছে মুক্তিপণের জন্যে, আর মধ্যবিত্তদের কুকুরগুলোকে নিচ্ছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে। সেটা কী তা আমরা এখনও জানি না।'

'আন্দাজ করো মধ্যবিত্তদের কুকুর সে কেন নেবে,' বিড়বিড় করল রবিন। 'মধ্যবিত্তরা তো যথেষ্ট মুক্তিপণও দিতে পারবে না। কুকুর বিক্রির দোকান আছে না কি লোকটার!'

'হতে পারে না,' এক কথায় নাকচ করে দিল কিশোর। 'ধাড়ি কুকুর কে কিনবে?' নীচের ঠোঁটে আবারও চিমটি কাটল কিশোর। 'তবে বিক্রি যে করতে চায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' ড্রয়ার ঘেঁটে একটা ভিযিটিং কার্ড বের করল ও। 'এক্সেলসিওর ল্যাব।'

ভ্রূ কুঁচকাল মুসা। 'তো কী হলো?'

'আমার ধারণা নেড়ি কুকুরগুলো সে কোনও রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে বিক্রি করার চেষ্টা করছে,' বলল কিশোর। 'সে-কারণেই ওগুলো চুরি করা।'

'ভিযিটিং কার্ডটা ওখানে যে-কেউই ফেলে যেতে পারে,' বলল মুসা।

'তা পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে আপাতত এই কার্ড ছাড়া আর কোনও সূত্র নেই আমাদের হাতে।'

কার্ডটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল রবিন। খানিকক্ষণ নীরবতায় কাটল, তারপর কিশোর বলল, 'আমার ধারণাটা সঠিক কি না সেটা জানার জন্যে এক্সেলসিওর ল্যাবে যেতে হবে। অনেক মানুষই আজকাল পশুপাখির ওপর নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিরুদ্ধে। তবুও আজও রিসার্চ চলছে। কোনও ল্যাব হয়তো গোপনে ডগন্যাপারের কাছ থেকে কুকুর কিনছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে বলতে হবে সহজে টাকা করার ভাল একটা পথ পেয়ে গেছে আমাদের ডগন্যাপার।'

'রাফিয়ানকে বিক্রি করার আগেই লোকটাকে ঠেকাতে হবে,' শুকনো গলায় বলল রবিন। 'হয়তো আমাদের সফলতার ওপর নির্ভর করছে রাফিয়ানের জীবন-মরণ।'

রিসিভার তুলে এক্সেলসিওর ল্যাবের নাম্বারে ডায়াল করল কিশোর। এতো সকাল সকাল ল্যাব খোলেনি, একটা মেশিন জবাব দিল। রেকর্ড করা মেসেজে বলা হলো, সকাল সাড়ে ন'টায় ল্যাবোরেটরি খুলবে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। এখনও নয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

চিফ ইয়ান ফ্লেচারের ই-মেইল থেকে পাওয়া নাম্বারগুলোয় ফোন করতে শুরু করল কিশোর। স্পিকারের সুইচ অন করে রেখেছে, যাতে বন্ধুরাও কথা শুনতে পায়।

কুকুর যা চুরি হয়েছে বেশিরভাগই চুরি হয়েছে বাড়ির সামনের উঠান থেকে। ওগুলোর মালিকরা কোনও লোককে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেননি। কোনও হলদে দরজাওয়ালা গাড়ি বা লাল ট্রাকও কারও নজরে পড়েনি। অনেকেই তাদের কুকুর হারিয়ে ভেঙে পড়েছে। 'কিউটি ছিল আমার মেয়ের সবচেয়ে ভাল বন্ধু,' এক মহিলা জানালেন। 'ওকে হারিয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে রোনা। জানি না এই দুঃখ ও ভুলবে কী করে।'

'আমরা কিউটিকে খুঁজে বের করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব,' কথা দিল কিশোর।

ও ফোন রাখার পর মুসা বলল, 'বাচ্চাদের কুকুর যে-লোক চুরি করে তাকে বিশেষ কোনও শাস্তি দেয়া উচিত।'

মোবাইল হোমের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে তাকাল রবিন। 'এখন যদি আমরা রওনা হই তা হলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ল্যাব খুলে যাবে।'

উঠল ওরা।

রকি বিচের দক্ষিণে একটা পার্কের পাশে এক্সেলসিওর ল্যাবোরেটরিজ। এক তলা লম্বাটে সাদা বাড়িটাতে জানালা প্রায় নেই বললেই চলে। দেখে মনে হয় মিলিটারির ব্যারাক। সামনে বড় একটা সাইনবোর্ডে লেখা: এক্সেলসিওর ল্যাবোরেটরিজ লিমিটেড।

পার্কিং লটে গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা, চলে এলো ভিযিটর লেখা একটা অফিসের সামনে। এখানেই দর্শনার্থীদের বসানো হয়।

ল্যাবের লবিতে আছে একটা অপেক্ষা করার জায়গা আর অন্যপাশে সাদা কাউন্টার। রিসেপশনিস্ট এক তরুণী, বছর বিশেক বয়স হবে তার, ইন্টারকমে কথা বলছে।

সুইচবোর্ডে ম্যানর নামটা দেখতে পেল কিশোর। ভিযিটিং কার্ডের পিছনেও এই একই নাম আছে।

রিসেপশনিস্ট ইন্টারকমের রিসিভার নামিয়ে রাখার পর ওদের দিকে চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল। এই বয়সী কয়েকটা ছেলে ল্যাবে কেন তা জানতে চায়। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন সাদা কোট পরা মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক। ঢুকে ওদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করতে পারি আমরা তোমাদের জন্যে, বয়েজ?'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর।

'আমি ডক্টর ব্লেক,' ল্যাব কোট পরা ভদ্রলোক জানালেন।

'আমরা এসেছি মিস্টার ম্যানরের সঙ্গে দেখা করতে,' বলল কিশোর। ভদ্রলোক ল্যাবোরেটরিতে কী কাজ করেন তা ওর জানা নেই।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লেক।

'না, কিন্তু জরুরি কাজে এসেছি।' কেন এসেছে জানাল কিশোর।

রাফিয়ানকে যতো দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করতে হবে।

'এসো আমার সঙ্গে।' ওদের পথ দেখিয়ে ল্যাবের ভিতর ঢুকলেন ব্লেক। সুইং-ডোর পেরিয়ে কাজের জায়গায় চলে এলো ওরা। করিডরের দু'পাশে সারি সারি অফিস। শেষে দুটো বড় বড় ল্যাবোরেটরি।

প্রথম অফিসটাই মিস্টার ম্যানরের। ভিতরে ঢুকে ওরা খেয়াল করল ডেস্কের উপর নেমপ্লেটে 'ডক্টর' লেখা আছে।

ডক্টর শ্যন ম্যানরের বয়স তিরিশের বেশি হবে না। কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ বাদামী চুলগুলো খোঁপা করে রেখেছেন। চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা। দেখলেই বোঝা যায় লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু বোঝেন না।

পরিচয়ের পালা এবার সারল মুসা। ডক্টর ব্লেক ওদের বসতে ইশারা করে নিজেও বসলেন।

বসবার পর কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এই ল্যাবে কি জন্তু-জানোয়ারের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়?'

'নিশ্চয়ই,' বললেন ডক্টর ম্যানর। 'এখন আমি কুকুরদের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছি। সয়া বেয্ড্ ডায়েটে বিভিন্ন কুকুরের ওজন কতোটা বাড়ে সেটাই আমার পরীক্ষার বিষয়বস্তু।' হাতের ইশারায় একদিকের দেয়াল দেখালেন তিনি। ওখানে ঝকঝকে খাঁচায় ছোট আকারের বেশ কয়েক জাতের কুকুর রাখা আছে। সবগুলোই নাদুসনুদুস। ওদের তাকাতে দেখে লেজ নাড়তে শুরু করল কয়েকটা।

'বলবেন আপনারা কোত্থেকে কুকুর সংগ্রহ করেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নড়েচড়ে বসলেন ডক্টর ম্যানর। 'তোমরা যদি অ্যানিমেল রাইটস অর্গানাইযেশন থেকে এসে থাকো, তা হলে আমি তোমাদের নিশ্চিন্ত করছি...'

'আমরা ওরকম কোনও সংগঠন থেকে আসিনি,' বলল মুসা। এবার ও ওদের তদন্তের ব্যাপারে খুলে বলল। 'আমাদের মনে হচ্ছে চোর হয়তো ল্যাবোরেটরিগুলোতে কুকুর বিক্রি করছে। ল্যাবগুলো হয়তো জানেও না যে ওগুলো চোরাই কুকুর।'

'গত কয়েকদিনে আপনাদের কেউ কুকুর বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে?'

জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমাকে দেয়নি,' জানালেন ডক্টর ব্লেক।

ভ্রূ কুঁচকে চেয়ারে হেলান দিলেন ডক্টর শ্যন ম্যানর। 'আমাকে দিয়েছে,' বললেন। 'পার্কিং লটে আমাকে থামিয়েছিল এক যুবক। এই এক সপ্তাহ হবে। বলেছিল মালিকছাড়া কুকুর সংগ্রহ করে দিতে পারবে সে, প্রতিটা পড়বে দু'হাজার ডলার করে।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'দেখতে কেমন ছিল সে?'

'অতোটা খেয়াল করিনি। তবে চুলগুলো বাদামী ছিল। এই আমার মতো। বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। চেহারা বলতে পারব না, চোখে সানগ্লাস ছিল। কপাল পর্যন্ত ঢাকা ছিল নাবিকদের উলের টুপিতে।'

'তার কাছ থেকে কোনও কুকুর কিনেছেন আপনি?'

'না। যুবককে দেখে আমার মনে হয়নি সে কোনও ভাল ব্রিডারের কোম্পানিতে কাজ করে। আমার কাছে একটা কার্ড চাইল, দিয়ে দিলাম। বলল পরে যোগাযোগ করবে। আমি রাজি হলাম। তখন আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সে।'

'তাকে যেতে দেখেছেন আপনি?'

'অবশ্যই!'

'কী গাড়ি চালাচ্ছিল সে?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডক্টর ম্যানর, তারপর বললেন, 'একটা পিকআপ ট্রাক। লাল একটা পুরোনো পিকআপ ট্রাক।'

'আপনি তো তাকে কার্ড দিয়েছেন,' বলল কিশোর। 'সে-ও কি আপনাকে কোনও কার্ড দিয়েছে?'

'না। জিজ্ঞেস করায় বলল শেষ হয়ে যাওয়ায় ছাপতে দিয়েছে কার্ড। তবে একটা নাম্বার দিয়েছে সে।' টেবিলের উপরের কাগজগুলো হাতড়ে একটা স্লিপ খুঁজে বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'এই যে। নিতে পারো এটা তোমরা। আমার কাজে আসবে না। প্রতিষ্ঠিত ব্রিডার না হলে কারও কাছ থেকে কুকুর কিনি না আমরা।'

নিজেদের কার্ড দিল কিশোর দুই ডক্টরকে, তারপর যুবক আবার যোগাযোগ করলে ওদের জানাতে অনুরোধ করে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে

এলো ওরা। ফিরতি পথ ধরে মুসা বলল, 'লোকটা ল্যাবোরেটরিতে কুকুর বিক্রি করতে চায়।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলেছে ওরা। 'কিন্তু লোকটা কে হতে পারে?' আপনমনে বলল রবিন। 'বর্ণনা অনুযায়ী নিক মিলহিজার আর হ্যারল্ড মুর–দু'জনের যে-কেউ হতে পারে লোকটা। এদিকে ডক্টর ম্যানরের চুলগুলোও বাদামী। লম্বাও কাঁধ পর্যন্ত। পাতলা-সাতলা লোক। তাঁকেও কি আমরা সন্দেহের মধ্যে রাখব?'

'আপাতত,' বলল কিশোর।

'আবার আমাদের পেছনের ওই লোকটাও সেই কুকুর চোর হতে পারে,' গম্ভীর চেহারায় বলল মুসা। রিয়ারভিউ মিররে পিছনে তাকিয়ে আছে ও।

ঘুরে তাকাল রবিন আর কিশোর। ওদের পিছন পিছন আসছে একটা লাল পিকআপ ট্রাক। ছায়ার মধ্যে থাকায় ড্রাইভারের মুখটা দেখা গেল না। গতি বাড়িয়ে কাছাকাছি চলে আসছে পিকআপটা। এবার ড্রাইভারের মুখ ঢাকা মুখোশটা দেখতে পেল ওরা। সর্বক্ষণ বড় বড় দাঁত বের করে হাসছে ওটা। মুসার ফোক্সওয়াগেনের পিছনে এসে জোরে গুঁতো দিল পিকআপ!

'গতি বাড়াও!' বলে উঠল রবিন।

'সম্ভব না!' জানাল মুসা। হুইলের পিছনে ঝুঁকে বসেছে। 'রাস্তাটা বড় বেশি সরু!'

'পাগল নাকি লোকটা!' ফ্যাকাসে মুখে বলল রবিন।

দড়াম করে আবার আঘাত হানল পিকআপ ট্রাক। গাড়ির চেয়ে অনেক ভারী ওটা। যে-কোনও সময় ফোক্সওয়াগেনটাকে ঠেলে ফেলে দেবে রাস্তা থেকে! নিজেদের সিট বেল্ট ঠিক আছে কি না দেখে নিল তিন গোয়েন্দা।

'আমাদের পাশ কাটাচ্ছে,' রিয়ারভিউ মিররে চোখ মুসার।

'রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় বোধহয়,' বিড়বিড় করল কিশোর।

গাড়ির পাশে চলে এসেছে পিকআপটা। ড্রাইভারের মুখোশটা

এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওটা না থাকলে চেহারাটা এখন স্পষ্ট দেখা যেত। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে লোকটা। আরেক হাত নীচে নামানো। ঝট করে ওটা তুলল সে। এক পলকও লাগল না রবিন আর কিশোরের বুঝতে তার হাতে ওটা কী।

'পিস্তল!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

কালো রঙের ভয়ঙ্করদর্শন একটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল তাক করছে লোকটা! সরাসরি মুসার দিকেই যেন তাক করছে সে!

নয়

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকে চেপে বসল মুসার পা। চাকাগুলো আটকে গেল, গাড়িটা পিছলে এগোতে শুরু করল হড়হড় করে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে পিকআপ।

কিন্তু তবুও বেশি দেরি হয়ে গেছে। ট্রিগার টেনে দিয়েছে লোকটা!

'ছপাৎ!'

মুহূর্তে ওদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল পিকআপ ট্রাকটা। ফোক্সওয়াগেনের গোটা উইন্ডশিল্ড লাল রঙের তরলে ভরে গেছে। সামনের কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না মুসা। আবার ব্রেকে পা চেপে বসল ওর। রাস্তাটা মনে করতে চেষ্টা করল। ওটা কি সোজা গেছে, না বাঁক আছে কোনও?

ধুপ করে একটা আওয়াজ হলো। ঝাঁকি খেয়ে থামল ফোক্সওয়াগেন। মুসা বুঝতে পারল সামনে বাঁক নিয়েছিল রাস্তা।

গতি কমিয়ে আনায় সাঙ্ঘাতিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে গুঁতো খেয়ে থেমে গেছে ওদের গাড়ি।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল মুসা, তারপর বলল, 'চলে গেছে পিকআপ। লাল রং না সরিয়ে গাড়ি চালানো যাবে না। আরেকবার আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল লোকটা।'

[illegible] মুসা, সেই সঙ্গে চাপ দিল পানির [illegible]। [illegible] রং।

[illegible] গোয়েন্দা। রংটা শুঁকে দেখল কিশোর, [illegible] পেইন্ট। লোকটার হাতে রং ছুঁড়বার পিস্তল ছিল [illegible]।'

গাড়ি মোছার তোয়ালে দিয়ে রংটা যতোটা সম্ভব ওঠাল ওরা। এবার ড্রাইভার অন্তত সামনের দিকটা দেখতে পাবে।

'পরে বাকিটা পরিষ্কার করা যাবে,' বলল কিশোর, নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। 'সেন্টার স্ট্রিটে যে কারওয়াশটা আছে ওখান থেকে রং তুলে নেব।' আবার রওনা হলো ওরা। ডক্টর ম্যানরের দেওয়া নাম্বারে মোবাইল থেকে ডায়াল করল কিশোর।

'আনসারিং মেশিন জবাব দিচ্ছে। জায়গাটা রকি বিচ সায়েন্টিফিক সাপ্লাই।' মেশিনটা বীপ দেওয়ার পর ফোনে বলতে শুরু করল কিশোর, 'আমরা রকি বিচের নতুন ল্যাবোরেটরি থেকে ফোন করছি। আমাদের ল্যাবের নাম কেমিকেল অ্যানালিসিস অ্যান্ড টেস্টিং। নতুন খুলেছি আমরা, কাজেই সবকিছু এখনও কেনা হয়ে ওঠেনি। সে-কারণেই ফোন করা। ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট টেস্টের জন্যে আমাদের পঁচিশটা কুকুর দরকার। আপনারা সাপ্লাই দিতে পারবেন?' মোবাইল হোমের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে কানেকশন কেটে দিল কিশোর।

'কেমিকেল অ্যানালিসিস অ্যান্ড টেস্টিং?' জিজ্ঞেস করল মুসা, হাসছে। 'কুকুর চাইছ তুমি, অথচ ল্যাবের নাম সংক্ষেপ করলে হয় ক্যাট!'

কিশোর আর রবিন মুচকি হাসল, কিছু বলল না।

কার ওয়াশে গিয়ে গাড়ি ঢোকাল মুসা। ওয়েইটিং রুমে বসল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল অ্যাটেন্ডেন্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই শক্তিশালী পানির ধারায় উইন্ডশিল্ড থেকে উঠে যেতে শুরু করল লাল রং।

হঠাৎ কিশোরের দিকে ফিরল রবিন, 'কাল রাতে কি নিক মিলহিজারই আমাদের চোখে গ্যাস মেরেছিল?'

'বলা যায় না,' বলল কিশোর। 'বড় বেশি অন্ধকার ছিল। লোকটা

যে-কেউ হতে পারে। এমনকী লোকটার চুল লম্বা কি না সেটাও দেখতে পাইনি। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টটা মিলহিজারেরই। চাকরির দরখাস্তেও ওই ঠিকানাই দিয়েছিল সে। কিন্তু নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের ওপর সে এভাবে হামলা করবে বলে মনে হয় না। তাতে করে তাকে সহজেই আমরা সন্দেহ করতে পারি এটা সে বুঝবে।'

'তা ঠিক,' বলল মুসা। 'কে ছিল কে জানে!'

'লোকটা যে-ই হোক, এতোক্ষণে বুঝে গেছে আমরা অতো সহজে হাল ছাড়ব না।' কিশোর গম্ভীর।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, কিশোর,' বলল মুসা। 'এসব যে-ই করে বেড়াক, লোকটা সে পেশাদার নয়। এখনও সত্যিকারের ভয়ঙ্কর কিছু সে করেনি। পেইন্ট গানের কারণে দুর্ঘটনা হতে পারত, কিন্তু সম্ভাবনা কম ছিল। আমাদের নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করছে সে। পেশাদার লোক হলে আমাদের থামাতে ভয়ঙ্কর কোনও ব্যবস্থা নিয়ে বসত এতক্ষণে। হয়তো গুম করে ফেলারই চেষ্টা করত।'

'ঠিক,' বলল কিশোর। 'তা ছাড়া, পেশাদার কেউ হলে এখনও কুকুর বিক্রির জন্যে চেষ্টা করত না। চুরির আগেই কুকুর বিক্রির ব্যবস্থা করে রাখত।'

'কুকুরগুলোর কিছু হওয়ার আগেই ওগুলোকে উদ্ধার করতে হবে,' দৃঢ় শোনাল মুসার গলা। 'নইলে রাফিয়ানের ব্যাপারে কী জবাব দেব আমরা জিনাকে?'

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?' বলল কিশোর। 'চাকরি হারানোর কারণে গ্রেগ লেবউফের ওপর কিন্তু খেপে নেই নিক মিলহিজার। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয়?'

'কিছুটা অস্বাভাবিক তো বটেই,' বলল মুসা। 'টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্যে তাকে চাকরিতে নিয়ে পরে কুকুরের হাগু পরিষ্কার করতে বলেছিলেন লেবউফ। নিক মিলহিজারের খানিকটা হলেও খেপে থাকার কথা।'

'হয়তো অভিনয় করছে,' মন্তব্য করল রবিন।

'আমি হ্যারল্ড মুরের কথা ভাবছিলাম,' বলল কিশোর।

'ফোরম্যানের কথা শুনে মনে হলো কাজে সে প্রায়ই যায় না। তার মানে এটাও হতে পারে যে, কুকুর চুরি করার জন্যে যথেষ্ট সময় পায় সে। প্রতিটা কুকুর দু'হাজার ডলার করে ল্যাবগুলোতে বিক্রি করতে পারলে অন্য কাজের তার কী দরকার! চলো, আজ একবার ড্রাই-ডকে ঘুরে আসি। তার সঙ্গে কথা বলে দেখা দরকার মনে কোনও সন্দেহ জাগে কি না।'

আরও দশ মিনিট অপেক্ষার পর গাড়িটা ফেরত পেল ওরা, এইমাত্র ধোওয়ায় ঝকঝক করছে। ওয়াশের বিল মিটিয়ে দিয়ে সোজা চলল ওরা বন্দর এলাকার দিকে। ড্রাই-ডকে পৌঁছে দেখল বিশাল জাহাজ স্টার অভ বারমেট ছেয়ে ফেলেছে শ্রমিকের দল। মনে হচ্ছে সারি সারি পিঁপড়ে নিয়ম ধরে কাজ করে চলেছে। ক্রেনে করে মালামাল তোলা-নামানো হচ্ছে।

শেডের কাছে ওরা পৌঁছোতেই ফোরম্যান এগিয়ে এলেন। 'কী খবর ছেলেরা? হ্যারল্ড মুরকে খুঁজছ নিশ্চয়ই? আজকে আছে ও, তোমাদের কপাল ভাল।' জাহাজের বো'র দিকে আঙুল তুললেন তিনি। 'ওই যে ওখানেই আছে। কাজে ইদানীং এতো ফাঁকি দিচ্ছে যে ভেবেছিলাম ওকে বাদই দিয়ে দেব।'

'আমরা ওঁকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না,' বলল কিশোর।

'গুড,' খুশি হলেন ফোরম্যান। তিন গোয়েন্দাকে পরার জন্য তিনটে শক্ত হ্যাট দিয়ে বললেন, 'ফাঁকি না মেরে অন্তত কিছু কাজ তো করুক ও!'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে হ্যাট মাথায় চাপিয়ে এগোল ওরা।

সূর্যের নীচে কাজ করে বাদামী হয়ে গেছেন হ্যারল্ড মুর। চেহারা দেখে মনে হলো রাগী মানুষ। কাজ নিয়ে ব্যস্ত। চারজন সঙ্গীর সঙ্গে একটা স্কিডে ফার্নিচার তুলছেন। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে সব বাঁধা। দড়িগুলো আবার শেকল আর স্টিলের কেবলের সঙ্গে আটকানো হয়েছে। সব মালামাল একটা বূম উপরে তুলে নেবে, পৌঁছে দেবে জাহাজে।

তিন গোয়েন্দাকে এগোতে দেখে ফিরে তাকালেন হ্যারল্ড মুর। ভাব

দেখে মনে হলো ছেলেদের দেখে বিরক্ত।

নিজেদের পরিচয় দিয়ে কেন এসেছে জানাতেই কিশোরকে বললেন, 'এসবের জন্যে সময় নেই আমার হাতে। তা ছাড়া, কোনও কোলি চুরির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

কিশোর চট করে প্রশ্ন করল, 'কোলি চুরির ব্যাপারেই আমরা এসেছি সেটা আপনাকে কে বলল?'

'তাতে তোমাদের কী?' মুখটা লাল হয়ে গেল হ্যারল্ড মুরের। 'তবুও বলছি। আমার বোন বলেছে। কোলিটা চুরি যাওয়ায় ওই জঘন্য ডগ-হাউস যদি বন্ধ হয়ে যায় তো আমি বলব যে কোলিটাকে চুরি করেছে তার মেডাল পাওয়া উচিত।'

'কিছু মনে না করলে বলবেন কি আপনি কোন্ ধরনের গাড়ি ব্যবহার করেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মনে করছি আমি,' ঘোঁৎ করে উঠলেন মুর। 'তোমাদের কোলি আমি চুরি করিনি বলেছি, এখন এটাও বলছি, শুনে রাখো, তোমাদের কোনও প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

'আর আপনার বোন?' না দমে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'অনেকের ধারণা কুকুর চুরির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে।'

'আমি বলছি নেই!' খেঁকিয়ে উঠলেন মুর। 'কেউ যদি এধরনের কথা বলে তা হলে তাকে আমার মুখোমুখি হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে আমার কাছে।' তিন গোয়েন্দার নাকের সামনে মুঠো নাচালেন তিনি।

'শান্ত হোন,' ঘাবড়ে গিয়ে বলল রবিন।

কিশোর বলল, 'আমরা কুকুরচুরির ব্যাপারে আপনাকে বা আপনার বোনকে দায়ী করছি না। আমরা শুধু চোরাই কুকুর উদ্ধার করতে চাইছি।'

কিশোরের দিকে ফিরে তাকালেন মুর। 'তা হলে যারা ওসব চুরি করছে তাদের গিয়ে প্রশ্ন করোগে যাও।'

দমল না কিশোর, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি গ্রেগ লেবউফ আর তাঁর স্ত্রীকে চেনেন?'

'না। চিনতে চাইও না। তবে শুনেছি কাল রাতে ওখানে ট্রাক থেকে দু'জন লোক কয়েকটা কুকুর নামিয়েছে। কী করছিল তারা বুঝতে পারেনি আমার বোন।'

'কী ধরনের ট্রাক?' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমার বোনও কিছু বলেনি।'

'ওটা কি কোনও কোম্পানির ভ্যান ছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'প্রেসিডেন্টের লিমাযিন হলেই বা আমার কী?' সঙ্গীদের দিকে একবার তাকালেন মুর। 'দেখো, এবার তোমরা যাও। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'হ্যারল্ড ঠিকই বলেছে,' যুবকের এক সঙ্গী বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ ব্যস্ত আমরা।'

'আমি আসছি, তেনজিং,' বললেন মুর। 'তুমি লেগে পড়ো।' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। 'তোমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি। শুনেছি আমার বোনকেও তোমরা বিরক্ত করেছ। এবার শেষবারের মতো সতর্ক করে দিচ্ছি, ওকে জ্বালাতন করতে যেয়ো না। গেলে পরিণতি ভাল না-ও হতে পারে।'

'আপনি কি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। কালো মুখটা থমথম করছে।

'না, সাবধান করছি।'

'কিন্তু আপনার বোনের কাছে যেতে হবে আমাদের,' বলল কিশোর। 'কাল রাতে তিনি কী দেখেছেন সেটা জানা জরুরি।'

'এরপর আর তোমাদের সতর্ক করব না।' মাটিতে থুতু ফেললেন হ্যারল্ড মুর। 'এবার দূর হও এখান থেকে।'

হ্যারল্ড মুরের সঙ্গীরা পরস্পরের দিকে তাকাল। বোধহয় দরকারে তারাও ওদের জোর করে সরিয়ে দেবে এখান থেকে, তারই প্রস্তুতি নিল।

ইশারা করলেন হ্যারল্ড মুর। কাছেই প্রাণ ফিরে পেয়ে গর্জে উঠল একটা ডিজেল এঞ্জিন। কেবলে বাঁধা ফার্নিচার উপরে উঠতে শুরু করল। ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। হ্যারল্ড মুর শুনতে পাবে না এমন দূরত্বে

পৌঁছে কিশোর বলল, 'এখন আমরা জানি কারিনা মুরের ভাইকে কোথায় পাওয়া যাবে। এবার চলো কারিনা মুরের ওখানে, তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে কাল রাতে তিনি কী দেখেছেন।'

প্ল্যাস্টিকের পাইপ ভরা স্টিলের ক্যারিয়ারের পাশ দিয়ে কিশোর আগে আগে চলেছে, পিছনে রবিন আর মুসা। পার্কিং এরিয়ার দিকে যাচ্ছে ওরা, এমন সময়ে ডক থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা।

'না! কেবল ছেড়ে দিয়ো না!'

ঘুরে তাকাল মুসা কে চিৎকার করছে বোঝার জন্য। ঠিক তখনই আরেকটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা।

'সাবধান!'

মেঝেতে একটা ছায়া ক্রমেই বড় হচ্ছে! মুসা আর রবিনের মাথার উপর তাকাল কিশোর।

জাহাজের স্টেটরুমের ফার্নিচার ভরা স্কিডটা সরাসরি মুসা আর রবিনের উপরই পড়তে যাচ্ছে!

'কেবল ছিঁড়ে গেছে!' চেঁচাল একজন কর্মী।

কিশোর স্পষ্ট দেখতে পেল, লোকটা ঠিকই বলেছে। সেফটি কেবল ছিঁড়ে গেছে। ফার্নিচার নীচে পড়ছে! পড়ছে ঠিক রবিন আর মুসার উপর!

'রবিন-মুসা! সাবধান!' কিশোরের গলা চিরে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো।

দশ

উপরের দিকে একবার তাকিয়েই চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা, রবিনকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে নিল একটা স্টিলের র‍্যাকের কাছে। ওটাতে ছয়ফুট লম্বা শতখানেক প্ল্যাস্টিকের পাইপ আছে। র‍্যাকের নীচে রবিনকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ও, নিজেও ঢুকে পড়ল।

ভারী ফার্নিচার ভরা স্কিড মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ওটার

এক কোনা আঘাত করল স্টিলের র‍্যাকে। উপরের দুটো তাক থেকে পাইপগুলো উড়াল দিল, যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে। র‍্যাকের বাকি পাইপগুলো পড়ে গেল মেঝেতে।

হতভম্ব কিশোর দেখল পাইপের নীচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে রবিন আর মুসা।

তবে ফার্নিচার ওদের উপর পড়েনি। হালকা পাইপগুলো সরিয়ে রবিন আর মুসাকে উঠে বসতে দেখল।

'লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'একটুও না,' জানাল রবিন।

স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল কিশোর। একটুর জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে রবিন আর মুসা।

ফোরম্যান দৌড়ে এসেছে, চেহারায় নিখাদ উদ্বেগ। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ভাগ্যিস গায়ে পড়েনি!'

কর্মীরা তিন গোয়েন্দা আর ফোরম্যানকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজনের দেখাদেখি বাকিরাও ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাইপ সরিয়ে নিতে।

'আরেকটু হলেই গিয়েছিলে,' বললেন ফোরম্যান। 'কেবলটায় দোষ ছিল।'

ডকের উপর চোখ বুলাল কিশোর। হ্যারল্ড মুর বেশ খানিকটা দূরে কাজ করছে। দুর্ঘটনা দেখেও এগিয়ে আসেনি সে।

'মিস্টার মুর এসে দেখছেন না কেন,' ফোরম্যানকে বলল কিশোর। 'তাঁর সঙ্গের কর্মীরাই তো বূমটা নিয়ে কাজ করছিল।'

'এড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের,' বললেন ফোরম্যান। 'ওর বোধহয় ধারণা ওকেই দায়ী করব আমি।'

কেবলটা দেখল কিশোর। মনে হলো না ধারাল কিছু দিয়ে ওটা কাটা হয়েছে। সম্ভবত ওজনের কারণে এমনিই ছিঁড়ে গেছে।

ফোরম্যান বললেন, 'এধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখি।' কিশোরের দিকে তাকালেন। 'বুঝতে পারছি তুমি ভাবছ এসবের পেছনে হ্যারল্ড মুরের হাত থাকতে পারে। যদি ব্যাপারটা দুর্ঘটনা না হয় তা হলে আমি তোমাদের জানাব।'

নিজেদের কার্ড দিয়ে ফোরম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। শেষবারের মতো হ্যারল্ড মুরকে একবার দেখে গাড়ি স্টার্ট দিল মুসা। এবার রওনা হলো ওরা কারিনা মুরের বাড়ি লক্ষ্য করে।

'বারান্দাতেই দাঁড়াও,' কিশোর কলিং বেল বাজানোর পর দরজা সামান্য ফাঁক করে বলে উঠলেন কারিনা মুর। 'হ্যারল্ড বলেছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলাও আমার ঠিক হয়নি। তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে নিষেধ করে দিয়েছে ও।'

'তা হলে মিস্টার মুরের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার এ-ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কথা হয়েছে দশ মিনিটও হয়নি। বলেছে তোমরা শিপইয়ার্ডে গিয়েছিলে, সেখানে দুর্ঘটনা ঘটায় তাকে সন্দেহ করে ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলেছ।' তিক্ত হাসলেন কারিনা মুর। 'আমার ছোট ভাই একটা মশাও মারতে পারে না।'

'মিস্টার মুরের কাছে শুনলাম কাল রাতে আপনি ডগ-হাউসের সামনে থেকে একটা ট্রাকে করে কুকুর নামানো দেখেছেন,' বলল কিশোর। 'তিনি কি ঠিক বলেছেন?'

'ঠিকই বলেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক বলেও মনে হয়নি।'

'কেন? ঠিক কী দেখেছেন আপনি?'

'বিচ্ছিরি চেহারার দুই যুবক-যুবতী। বলতে নেই, তা ছাড়া আলোও কম ছিল, কিন্তু ওদের দেখে মনে হচ্ছিল হরর সিনেমা থেকে উঠে এসেছে। তখন মনে হয়েছিল হয়তো তারা রাবারের মুখোশ পরে আছে।'

'কতোগুলো কুকুর নামিয়েছে তারা?'

'পাঁচ-ছয়টা তো হবেই। বলা মুশকিল। ট্রাক থেকে কুকুর নামিয়ে ওই জঘন্য ডগ-হাউসে ঢুকল। আমি কিচেনে গিয়েছিলাম দুধ আনতে, কাজেই পরে কী হলো আর দেখতে পারিনি। পরে আবার যখন ওদিকে তাকালাম, দেখি ট্রাকটা নেই।'

'রাত তখন কতো হবে বলবেন কি?'

'সাড়ে তিনটা বা পৌনে চারটা তো হবেই। ঘুম আসছিল না।'

খুকখুক করে কাশল কিশোর। 'আপনি বলেছেন ট্রাক থেকে তারা কুকুর নামিয়েছে। ট্রাকটা কি কোনও কোম্পানির ট্রাক ছিল?'

'জানি না। একটা পিকআপ ট্রাক। খুব পুরোনো জিনিস।'

'কোন্ রঙের ছিল বলতে পারবেন?'

'বাইরে তখন অন্ধকার ছিল। তবে আমার মনে হয়েছে ওটার রং লাল বা তামাটেই হবে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

'তারপর আপনি মিস্টার মুরের ঘুম ভাঙিয়ে জানালেন কী দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই যে আবার তোমরা হ্যারিকে সন্দেহ করতে শুরু করেছ,' গলার স্বরে মনে হলো কারিনা মুর রেগে যাচ্ছেন। 'আমার আর হ্যারির উপরে দোষ চাপিয়ে কোনও ফায়দা হবে না। আমরা কোনও বেআইনী কাজে নেই।' দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন কারিনা মুর, হাত তুলে তাঁকে ঠেকাল মুসা।

'মিস্টার মুর তখন বাসায় ছিলেন, তা-ই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঘুমাচ্ছিল ও। তোমাদের আর একটা কথারও উত্তর দেব না আমি। ভেবেছ কারণ ছাড়াই যার-তার কাছে জবাবদিহি করব?' থাবড়া দিয়ে দরজার উপর থেকে মুসার হাতটা সরিয়ে দিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলেন কারিনা মুর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে হলে কতোরকম ব্যবহার যে পেতে হয় মানুষের কাছ থেকে! গাড়িটার দিকে পা বাড়াল ওরা। কিশোর বলল, 'কারিনা মুরের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে তাঁর ভাই হ্যারল্ড মুর আমাদের দোকানের ভেতর খাঁচায় বন্দি করেনি। মরিচের গ্যাস চোখে মারাটাও তার কাজ নয়।'

'তবে তাঁর কথা থেকে একটা ব্যাপার জানা গেল,' বলল মুসা। 'লাল ট্রাক নিয়ে এসেছিল এখানে কেউ। ট্রাকটা কে চালায় সেটা বের করতে পারলে হয়তো এই রহস্যের সমাধান হবে।'

'চলো, এদিকে যখন এসেই পড়েছি তো ডগ-হাউসে একবার একটু উঁকি দেওয়া যাক,' প্রস্তাব দিল কিশোর।

ওরা ঢুকে দেখল ফোনে কথা বলছে আয়োলা মর্টন। থ্যাঙ্ক ইউ বলে ফোন রেখে দিল। মৃদু হাসল ওদের দেখে, জিজ্ঞেস করল, 'তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?'

'শীঘ্রি চোর ধরা পড়ে যাবে,' বলল কিশোর। যতোটা আত্মবিশ্বাস ওর গলায় ফুটল ততোটা মোটেও অন্তরে অনুভব করছে না ও।

'তা-ই নাকি? দারুণ খবর!'

'তবে এখনও কয়েকটা সুতো জোড়া দিতে হবে,' বলল মুসা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো রাতের ডিউটিতে আছেন তা-ই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আজকে আমার ডবল শিফট। মিসেস লেবউফ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে গেছেন। মিস্টার লেবউফ গেছেন হলিউডের মোটেলটা কেনার ব্যাপারে আলোচনা করতে। আমি একা।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। 'আমরা শুনলাম গত রাতে এখানে কয়েকটা কুকুর আনা হয়েছে।'

'গতরাতে মিসেস লেবউফ ডিউটি দিয়েছেন,' বলল আয়োলা। 'মাঝরাতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর বিশ্রাম নিতে যান।'

'তা হলে রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় আপনিই ডিউটিতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো কুকুর আনার ব্যাপারে কিছু জানি না! কার কাছে শুনলে রাতে কুকুর আনা হয়েছে?'

'সেটা আপাতত বলা যাবে না,' নরম গলায় বলল কিশোর।

'নিশ্চয়ই কারিনা মুরের কাছ থেকে শুনেছ!' মুখটা লাল হয়ে গেল আয়োলা মর্টনের।

'এখন এ-ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে চাই না।' নিজের মত থেকে সরল না কিশোর।

রেগে গেছে আয়োলা মর্টন। বলল, 'মহিলা নির্ঘাত বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলেছে।'

'কেন উনি মিথ্যে বলবেন?'

'অন্য কারও ওপর যাতে সন্দেহ পড়ে সেজন্যে।' হঠাৎ আয়োলার চেহারায় অপরাধবোধের ছাপ পড়ল। কেমন যেন মিইয়ে গেল সে।

'কী ব্যাপার, মিস মর্টন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কোনও সমস্যা?'

বিব্রত দেখাল আয়োলাকে। 'আগে প্রমিয করো কাউকে বলবে না।'

'কী ব্যাপারে প্রমিয সেটা না জানলে...' কথা শেষ করল না কিশোর।

'রাতে বার কয়েক আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাউকে বোলো না প্লিজ। আমার চাকরি চলে যাবে।'

'আসলে আপনি বলতে চাইছেন ডিউটির সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর।

'অনেকখানি সময় ঘুমিয়েছি,' স্বীকার করল আয়োলা। 'মিস্টার লেবউফ শ্যারনকে বিদায় করে দেয়ার পর থেকে দ্বিগুণ ডিউটি করতে হচ্ছে আমাকে।'

'আপনি কিছু মনে না করলে আমরা কেনেলটা আরেকবার ঘুরে দেখতে চাই,' বলল কিশোর।

'কোনও সমস্যা নেই,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল আয়োলা মর্টন। টুল থেকে নেমে আগে আগে চলল সে। চাবি দিয়ে ভিতরে যাওয়ার দরজাটা খুলল।

ভিতরে ঢুকে কিশোর-মুসা-রবিন দেখল দু'পাশের সবগুলো খাঁচাতে এখন কুকুর আছে। 'ব্যবসা আগের চেয়ে ভাল যাচ্ছে,' মন্তব্য করল কিশোর।

'হ্যাঁ, আগের চেয়ে ভাল,' বলল আয়োলা। 'তবে মিস্টার লেবউফ এখনও সন্তুষ্ট নন।'

এক ক্যান ডগট্রিট বিস্কিট খুলে কুকুরগুলোকে খাওয়াতে শুরু করেছে মুসা, তবে ওর কান খাড়া। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করল ও। একটা গোল্ডেন রিট্রিভারের গলার কলারে মালিকের নাম আর ঠিকানা লেখা একটা কার্ডবোর্ড ঝুলছে। কিন্তু পাশের কাঁচার কুকুরটার গলায় ওরকম কোনও কার্ডবোর্ড নেই।

ওটা দেখাল মুসা। 'এটার মালিক কে?'

'এখনও আমি ওটার মালিকের নাম টাইপ করে উঠতে সময় পাইনি,' লালচে হয়ে গেল আয়োলার চেহারা। 'আজকে তোমরা এসে শুধু আমার কাজের খুঁতই দেখতে পাচ্ছ।' তিন বন্ধুর দিকে পালা করে তাকাল তরুণী, তারপর নরম গলায় বলল, 'প্লিজ, মিস্টার লেবউফকে কিছু বলে দিয়ো না। এই কাজটা সত্যিই আমার খুব দরকার। গাড়ির তেল, মেরামতির খরচ, অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া...' মিইয়ে গেল আয়োলার কণ্ঠ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অত্যন্ত শঙ্কিত।

'বেশ কয়েকটা কুকুরেরই মালিকের নাম এখনও লেখা হয়নি,' বলল মুসা। কেনেলের দরজায় ঝোলানো ক্লিপবোর্ডটা দেখেছে ও। 'এখানে অন্তত বিশটা কুকুর আছে। আর তাদের মধ্যে নাম লেখা মাত্র পনেরো-ষোলোটা।'

'জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল আয়োলা। 'বাকিগুলোর মালিকের নাম লিখে ফেলব আমি।' ফোন বেজে উঠল অফিসে। 'এক্সিকিউয মি,' বলে প্রায় দৌড়ে চলে গেল আয়োলা।

কুকুরের লিস্টিতে চোখ বুলাল কিশোর, রবিন আর মুসা ঘুরে ঘুরে কুকুরগুলো দেখছে। খানিক পরই কেনেলের দরজায় আয়োলার মুখ দেখা গেল। বিস্মিত স্বরে সে বলল, 'ফোনটা কিশোরের!'

অফিসে ঢুকল কিশোর, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল, 'কিশোর পাশা বলছি।'

রবিন আর মুসাও চলে এসেছে ওর পাশে। কিশোরকে আর কিছু বলতে শুনল না ওরা। কিশোর শুধু রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেছে, কথা যা বলার বলছে ওদিকের লোকটা। খানিক পরে রিসিভারটা আয়োলার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। রবিন-মুসা খেয়াল করল কিশোর গুডবাই বলেনি।

'কী ব্যাপার?' রিসিভার নিল আয়োলা।

'কী হলো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হুমকি দিল,' শুকনো গলায় বলল কিশোর। 'বলেছে: এক্ষুনি তদন্ত বন্ধ করো, নইলে সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়ে যাবে।'

রবিন প্রশ্ন করল, 'গলাটা কার চিনতে পেরেছ?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিশোর। 'মুখে বোধহয় রুমাল চেপে ধরে রেখেছিল। আবছা শোনাচ্ছিল গলাটা। কী বলেছে জানো? বলেছে আমরা যদি তদন্ত বন্ধ না করি, তা হলে রাফিয়ানের লাশ পৌঁছে যাবে স্যালভিজ ইয়ার্ডে!'

এগারো

'কুকুর চোর পরিষ্কার কথা বলেছে,' আবার বলল কিশোর। 'আমরা যদি তদন্ত বন্ধ না করি, তা হলে রাফিয়ানকে খুন করবে সে।'

'যা বলছে সেটা করাই বোধহয় তোমাদের উচিত হবে,' কাঁপা গলায় বলল আয়োলা। 'ভয়ঙ্কর খারাপ লোক নিশ্চয়ই, নইলে এরকম হুমকি দিত না।'

'লোকই তা আপনাকে কে বলল?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর। 'গলার আওয়াজে তো বোঝার উপায় ছিল না।'

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আয়োলা, তারপর বলল, 'আন্দাজ করে নিয়েছি কুকুর চুরির পেছনে পুরুষমানুষেরই হাত আছে। তবে বলা যায় না, মেয়েরাও তো চুরি করে।'

'আপনাকে আমরা সন্দেহ করছি না,' পরিবেশ সহজ করতে বলল কিশোর। 'সেই প্রথম থেকেই আমাদেরও ধারণা কোনও লোকই কাজগুলো করছে। কিন্তু টেলিফোনে যে হুমকি দিল, তার গলা এতো চাপা শোনাচ্ছিল যে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায়নি।'

'এমন কী হতে পারে হ্যারল্ড মুর ফোনটা করেছিল?' জিজ্ঞেস করল আয়োলা। 'হয়তো বোনের হয়ে নোংরা কাজগুলো সে-ই করছে।'

'ও ব্যাপারেও আমরা ভেবেছি,' বলল কিশোর।

মুসা আলোচনায় যোগ দিল। 'এমনও হতে পারে নিক মিলহিজারই কুকুরচোর। তাঁর সঙ্গে ইদানীং আপনার যোগাযোগ হয়েছে কোনও?'

'না, তার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি আমার চাকরি ছাড়ার পর থেকে। একসঙ্গে কাজ করতাম, সেই সূত্রে পরিচয়। মিস্টার লেবউফের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাবার পর আর কোনও খবর রাখিনি।'

'কাজে কি গাড়ি নিয়ে আসতেন মিলহিজার?' প্রশ্ন করল রবিন।

'মনে হয়,' দ্বিধার ছাপ পড়ল আয়োলার কণ্ঠে। 'তবে খেয়াল করে দেখিনি।'

'তাঁর পিকআপ ট্রাক কখনও দেখেননি?' চট করে এবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পিকআপ না গাড়ি তা জানি না। আসলে একেবারেই ভাবিনি এসব নিয়ে।'

'আর হ্যারল্ড মুর?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আপনি তো বলেছেন কয়েকবার তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছেন। তিনি কি গাড়ি ব্যবহার করেন?'

'না।' মাথা নাড়ল আয়োলা। 'বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছি।' টেবিলে রাখা বেশ কিছু কাগজ তুলে নিল তরুণী, ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি হাসল। 'শোনো, কিছু মনে কোরো না, তবে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, মিসেস লেবউফ আসার আগেই শেষ করতে হবে।'

'আমরা আর আপনার সময় নষ্ট করব না,' বলল কিশোর। 'কিন্তু দুটো কথা। এক, মিসেস লেবউফকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলবেন। আর দুই, ডিউটির সময় জেগে থাকাই আপনার জন্যে মঙ্গল হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল আয়োলা মর্টন। ওদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

মুসার গাড়িতে উঠে কিশোর বলল, 'আমরা ডগ-হাউসে আছি সেটা ডগন্যাপার জানল কী করে?' অজান্তেই চারপাশে একবার দেখে নিল ও। মন বলছে লোকটা কাছাকাছি কোথাও আছে।

রবিন প্রশ্ন তুলল, 'ফোনটা কিশোরের সেটা জানানোর আগে কতোক্ষণ দেরি করেছে আয়োলা মর্টন?'

'কয়েক সেকেন্ড,' জবাব দিল কিশোর।

রিয়ার ভিউ মিররটা দেখে নিয়ে রওনা হলো মুসা। গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, 'কেন ভাবছ এসবের সঙ্গে আয়োলা মর্টনের কোনও সম্পর্ক আছে? কিশোর, তোমার কি ধারণা সে-ই ফোনে বলেছে ওখানে আছি আমরা?'

'সম্ভব,' বলল কিশোর। 'হয়তো বলেছে। আমার যতোদূর মনে পড়ে ও শুধু ফোন তুলে হ্যালো বলেছিল। তারপরই আমাকে ডেকে দেয়।'

'তা হলে কাকে সন্দেহ করব আমরা?' হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'হ্যারল্ড মুর, নাকি নিক মিলহিজার?'

'দু'জনকেই সন্দেহ করব,' বলল কিশোর। 'আমাদের দরকার প্রমাণ। তার আগেই কাউকে আমরা অভিযুক্ত করতে পারি না। ...আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? লাল ট্রাক বা হলদে দরজাওয়ালা গাড়ি যদি হ্যারল্ড মুরের হতো তা হলে একবারও কি ওগুলো আমরা ড্রাই-ডকে দেখতে পেতাম না?'

'হয়তো অন্য কোথাও পার্ক করে,' বলল মুসা।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, তারপর মোবাইল ফোনটা বের করে কর অফিসে ডায়াল করল। এবার মিস্টার বার্লিসনকে পাওয়া গেল। তিনি জানালেন ওয়্যারহাউসটা রয়াল রেস্টোরেশন নামের এক কোম্পানির। ওই একই কোম্পানি ড্রাই-ডকেরও মালিক। বন্দরের ধারেকাছের বেশিরভাগ ওয়্যারহাউস আর দোকানপাটেরও মালিক এই আর.আর.সি।

মিস্টার বার্লিসনকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর, বন্ধুদের জানাল কী জেনেছে।

'তা হলে তো ওয়্যারহাউসের পেছনের দরজার কথা হ্যারল্ড মুরের জানা থাকা স্বাভাবিক,' বলল মুসা। 'ডক কর্মীদের হয়তো ওটা ব্যবহার করারও অনুমতি আছে।'

'প্রমাণ, আমাদের দরকার অকাট্য প্রমাণ,' বলল কিশোর। 'এবার চলো, ফেরা যাক।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে গাড়ি রেখে সোজা কিচেনে চলে এলো ওরা,

হালকা নাস্তা সেরে নিল। বেরিয়ে মোবাইল হোমে যাবে ঠিক করেছে, এমন সময় কিচেনের ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলল রবিন। ওপ্রান্তের কথা শুনল হ্যালো বলার পর, তারপর রিসিভার রেখে দিল। মুখটা লালচে দেখাচ্ছে ওর। বলল, 'লোকটা আমাদের পনেরো মিনিট সময় দিয়েছে মনস্থির করার! তদন্ত বন্ধ করতে হবে, সেই সঙ্গে এ'কয়দিন তদন্ত করেছি বলে এক হাজার ডলার দিতে হবে, তা হলে রাফিয়ানকে ফেরত দেবে সে! পনেরো মিনিট পর আবার ফোন করবে বলে রেখে দিল।'

পনেরোটা মিনিট যেন পনেরো ঘণ্টার সমান দীর্ঘ। অপেক্ষার সময়গুলো যেন কাটতেই চায় না। আবার ফোন বেজে উঠতেই কিশোর ধরল এবার।

'কী সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা?' চাপা একটা গলা জিজ্ঞেস করল। বোধহয় মুখের উপর তোয়ালে রেখে কথা বলছে।

'আমরা রাফিয়ানকে ফেরত চাই,' বলল কিশোর। 'সেজন্যে আপনি যা বলবেন সেই মতোই কাজ করব আমরা।'

কিশোর আর ডগন্যাপার কথা বলছে, এর ফাঁকে রাশেদ চাচার প্যারালাল ফোনের কলার আইডি বক্স চেক করে দেখল মুসা। রবিন খসখস করে লিখে নিল লোকটা কোন্ নাম্বার থেকে ফোন করেছে। মোবাইল থেকে ফোন কোম্পানিতে কল করল এবার মুসা, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ওটা বে স্ট্রিটের একটা পে-ফোন। জায়গাটা বন্দরের কাছেই।

'আমরা শুধু রাফিয়ানকে ফেরত চাই না, অন্য কুকুরগুলোও ফেরত চাই,' কিশোরকে বলতে শুনল ওরা।

সুইচ টিপে রিসিভার নামিয়ে কথা বলছে এখন কিশোর, স্পিকারে ডগন্যাপারের কথা শুনতে পেল ওরা। 'যা বলেছি তা ওই একবারই বলেছি। রাফিয়ানকে ফেরত পাবে, তার বদলে দিতে হবে এক হাজার ডলার। কথা দিতে হবে তদন্ত করবে না আর। নইলে রাফিয়ানের লাশ পাঠিয়ে দেব।'

'অন্য কুকুরগুলোর কী হবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রাফিয়ানকে ফেরত দেয়ার পরও যদি তোমরা তদন্ত করো তা হলে সাধারণ কুকুর যে-কয়টা আছে, প্রতিদিন ওগুলোর একটা করে মেরে তোমাদের ঠিকানায় পাঠাব।' একটু বিরতি, তারপর ডগন্যাপার জিজ্ঞেস করল, 'আর কোনও প্রশ্ন?'

'না।' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'বুদ্ধিমান ছেলে,' খিকখিক করে হাসল লোকটা। 'এবার শোনো আমি কী করতে বলি।'

রবিনকে ইশারা করল কিশোর, রবিন নোটবুক আর কলম নিয়ে তৈরি হয়ে গেল।

'লুকআউট পয়েন্টে আজ মাঝরাতে আসবে। পুবের পার্কিং লটে গাড়ি রাখবে। ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জার, দু'দিকের জানালার কাঁচই নামিয়ে রাখবে। তারপর অপেক্ষা করবে। ওখানে তোমাদের পরবর্তী নির্দেশ দেয়া হবে। যদি কোনও চালাকি করতে যাও, যেমন পুলিশে রিপোর্ট করা বা অন্য কিছু, তা হলে রাফিয়ানকে এমন একটা ইঞ্জেকশন দেব যে ওর ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন। সেক্ষেত্রে আমি আবার ফোন করে তোমাদের জানিয়ে দেব কোথা থেকে রাফিয়ানের লাশ সংগ্রহ করতে হবে। যা বলেছি মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'গুড,' সন্তুষ্ট মনে হলো লোকটাকে, তারপর বলল, 'আরেকটা কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কী?'

'তুমি আর ওই কালো ছোকরা এসবের মধ্যে থাকবে না। শুধু তোমাদের বন্ধু যাবে ওখানে। একমাত্র তা হলেই রাফিয়ানকে ফেরত দেব। ঠিক মাঝরাতে। রবিন মিলফোর্ড একা এক হাজার ডলার নিয়ে আসবে। কোনও চালাকি নয়। রাখছি।' ফোনের লাইন কেটে গেল।

বারো

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটা ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু কীভাবে?

'এসো একটা পরিকল্পনা করে ফেলি,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'লোকটার কথা মত রবিন একা যাবে। ড্রাইভিং সিটে ও একাই থাকুক। মুসা, তুমি লুকিয়ে থাকবে পেছনের সিটের সামনে পা রাখার জায়গায়। আমি থাকব গাছের আড়ালে কাছাকাছি কোথাও। লোকটার দৈহিক আকৃতি মনে আছে? পাতলা-সাতলা লোক। একা আসবে বলেই মনে হয়। তা-ই যদি আসে, তা হলে তাকে তিনজন মিলে কাবু করতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। এবার মুক্তিপণের টাকা। গত গ্রীষ্মে স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করে আমরা বারোশো ডলার পেয়েছিলাম। ওখান থেকে একহাজার ডলার নিয়ে যাব আমরা। কারও কোনও কথা?' দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। ওরা কিছু না বলায় আবার ও বলল, 'চাচীর কাছে অনুমতি নিয়ে নেব আমি। তোমরা আন্টিদের বলতে পারো আজ রাতে আমার বাসায় থাকবে। ঠিক আছে?'

নীরবে সায় দিল রবিন আর মুসা। রাতে ওরা বাইরে বের হবে, কাজেই চাচীর অনুমতি আদায় করাটাই সবচেয়ে কঠিন হবে। সেটার দায়িত্ব কিশোর নিয়েছে।

বাসা থেকে অনুমতি পেতে কোনও অসুবিধে হলো না রবিন আর মুসার।

খালি গোয়েন্দাগিরি! কখন কোন্ বিপদে পড়বে ঈশ্বর জানেন! সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি আমি কখন কী হয়ে যায়! নানা কথাই বললেন মেরি চাচী, কিন্তু ওদের বাধা দিলেন না। অনুমতি দিয়ে বলে দিলেন, 'সাবধানে থাকবি তোরা।'

তাঁকে ওরা কথা দিল, কোনও ঝুঁকি নেবে না।

রাত এগারোটার সময় রবিনের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন আর মুসা। মুসা শুয়ে আছে পিছনের পা-দানীতে। স্যালভিজ ইয়ার্ডের উপর নজর রাখা হতে পারে ভেবে পনেরো মিনিট পর ওর পুরোনো এইচ হান্ড্রেড এস মটর সাইকেল নিয়ে ওদের তৈরি নতুন গোপন দরজা গোপন ছয় দিয়ে বের হলো কিশোর। গোপন ছয় দেয়ালের সঙ্গে মিশে থাকা চুনকাম করা পুরু কাঠের শক্ত একটা ফটক, দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা আসলে দেয়াল নয়। বন্দরের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলেছে কিশোর। ঘুরপথে বন্দরের কাছের ওই পার্কে পৌঁছোবে।

অনেক পথ ঘুরে পিছনে ফেউ লাগেনি বুঝে বন্দরের দিকে চলল ও।

আজ রাতে চাঁদ ওঠেনি। নিশ্চল বাতাসে থোকা থোকা কুয়াশা ভাসছে। পার্কের কাছে গিয়ে মটর সাইকেলের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল কিশোর, পুব পার্কিং লটে ঢুকে দ্বিচক্রযানটা পার্ক করে রেখে দেখল প্রাচীন দুটো বিচ গাছের ছাউনির নীচে গাড়ি রেখেছে রবিন। আবছা ভাবে রবিনকে সামনের সিটে বসে থাকতে দেখল ও। মুসা নিশ্চয়ই পিছনে লুকিয়ে শুয়ে আছে।

নির্জন পার্ক থমথম করছে। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল কিশোর, চারপাশে নজর বুলাচ্ছে।

অ্যাসফল্টের উপর পড়া আবছা আলো আর কুয়াশার কারণে কিশোরের প্রথমে মনে হলো নড়াচড়াটা ওর চোখের ভুল। তারপর আবার নড়াচড়া দেখতে পেল ও। কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি নিঃশব্দে রবিনের গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। চোখ কুঁচকে আরও ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল কিশোর।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, এখন সরাসরি রবিনের গাড়ির দিকে দৌড়ে চলেছে। টান টান উত্তেজনা অনুভব করল কিশোর। লোকটা গাড়ির প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালা দিয়ে কী যেন ছুঁড়ে দিয়েছে ভিতরে। কী? কে এই লোকটা? কিশোর চিন্তা করল, ধাওয়া করবে নাকি ও? নিজেকে সাবধান করল, পরিকল্পনা মতো কাজ করতে হবে। আগে মুসা আর রবিন লোকটাকে ধরুক, তারপর সাহায্য করতে হাজির হবে ও।

না থেমে দৌড়ে চলে গেল লোকটা।

'কিশোর?' ছোট্ট মাইক্রোফোনে রবিনের গলা শুনতে পেল কিশোর।

'কী, রবিন?'

'লোকটা একটা চিঠি ফেলে গেছে।' কাগজের ভাঁজ খোলার আওয়াজ শুনতে পেল কিশোর। জোরে জোরে পড়ল রবিন গাড়ির ভিতরের হলদে বাতির আলোয়। ওর পড়া শেষ হতে কিশোর জানতে চাইল লোকটার চেহারা ও দেখেছে কি না।

'না। শুধু পিঠ দেখেছি।'

'নির্দেশ মতো কাজ করো। মুসা তৈরি তো?'

'হ্যাঁ। ঠিক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব আমি এখানে, তারপর গাড়ি থেকে বের হবো।'

পাঁচটা মিনিট যেন পাঁচ বছর, সময়টা আর পার হতে চায় না। তারপর বের হলো রবিন। দরজা বন্ধ করে দিল। মুসা এখনও শুয়ে আছে পিছনের পাদানীতে। বদলে গেছে ওদের পরিকল্পনা। লোকটা রাফিয়ানকে নিয়ে আসেনি, বদলে পরবর্তী নির্দেশ লেখা কাগজ দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

পার্কিং লট পার হচ্ছে রবিন, হাতে মানিব্যাগ। কিশোরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে যাচ্ছে ও। অন্য কোথাও ওকে দেখা করতে বলেছে ডগন্যাপার।

কিশোর অস্বস্তি নিয়ে দেখল, সিঁড়ি বেয়ে অবযার্ভেশন ডেকে উঠছে রবিন। ওখানে সমুদ্রের উপর বেড়ে থাকা একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মে মুক্তিপণ আর বন্দিবিনিময় হবে। তখন অন্তত চারশো ফুট উঁচুতে থাকবে রবিন। নীচে রুক্ষ পাথুরে সৈকত। মুসা বের হলো এবার গাড়ি থেকে। ছায়ায় মিশে নিঃশব্দে রবিনের পিছু নিয়ে চলেছে সে। অপেক্ষা করল কিশোর।

ডগন্যাপারের দেওয়া কাগজে লেখা আছে রবিনকে অবযার্ভেশন ডেকে যেতে হবে। সেদিকেই চলেছে মুসাও। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। 'চোর!' ট্র্যান্সমিটারে রবিনের চিৎকার শুনতে পেল কিশোর। মুসাকে দৌড় দিতে দেখল। 'আপনি বলেছিলেন রাফিয়ানকে ফেরত দেবেন!'

ঝড়ের বেগে ছুটছে মুসা, দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল। দেরি করল না কিশোরও, দৌড় দিল অবযার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ি লক্ষ করে। 'আহ্!' রবিনের আর্তচিৎকার শুনতে পেল। তার পরপরই ট্র্যান্সমিটারের কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অন্ধকার পার্কটা যেন ভুতুড়ে, চারপাশে আর কোনও শব্দ নেই। মুসাকেও দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ি টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেছে ও। জুতোর ফিতে খুলে যাওয়ায় হোঁচট খেল কিশোর। ওগুলো বাঁধতে গিয়ে বেরিয়ে গেল মূল্যবান একটা মিনিট। আবার ছুটল ও সিঁড়িগুলোর দিকে। তারপর মত পাল্টাল। ঘুরপথে ছুটল সৈকতের দিকে। ওদিক থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠবে। দু'দিক দিয়ে তা হলে ঘিরে ফেলা যাবে কুকুর চোর লোকটাকে।

ওদিকে প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে পড়েছে মুসা। আগেও এখানে এসেছে কয়েকবার। তবে সবসময় এসেছে দিনে। কিন্তু এখন চারপাশে ঘন কুয়াশার রাজত্ব। এক হাত সামনেও দেখা যায় না। রবিনের অস্ফুট কথা শুনেছে মুসা, বুঝতে পারছে বিপদে পড়েছে রবিন। ওর সাহায্য দরকার। কিন্তু কোথায় রবিন? সাদা কুয়াশার দেয়ালের কারণে কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। কোনও আওয়াজও নেই।

'রবিন?' ডাকল ও। এখন আর ওদের পরিকল্পনা কাজে আসবে না। 'রবিন?'

প্ল্যাটফর্মের কিনারায় চলে এসেছে ও, আরেকটু হলেই নীচে পড়ত, একেবারে শেষ সময়ে সামলে নিল। এদিক দিয়ে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি নেমে গেছে সৈকতে।

জবাব দিল না রবিন।

আরও কয়েকবার ডাকল মুসা, সাড়া নেই কোনও।

গা ছমছম করা নীরবতা। শিউরে উঠল মুসা। এই একটু আগে প্ল্যাটফর্মের উপর দু'জনের উপস্থিতি টের পেয়েছে ও। রবিন আর ডগন্যাপার কোথায় গেল?

নিস্তব্ধ সৈকত। নির্জন। এতো রাতে কেউ নেই আর। প্ল্যাটফর্মে ওঠার

সিঁড়িটা খুব সরু। ওটার কাছে পৌঁছে একটু থামল কিশোর। টর্চ জ্বেলে বালিতে পায়ের ছাপ দেখল। কোনওটাকেই নতুন মনে হলো না। তা হলে কি এদিক দিয়ে নামেনি এখনও ডগন্যাপার আর রবিন-মুসা? সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলো ও। কুয়াশার কারণে নিজেকে ওর প্রায় অন্ধ বলে মনে হচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। থমকে দাঁড়াল কিশোর। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। রবিন না মুসা করল আওয়াজটা?

একটা অস্ফুট চিৎকার ভেসে এলো কুয়াশার ভিতর থেকে। 'রবিন? মুসা?' গলা কেঁপে গেল কিশোরের।

'কিশোর? আমি এখানে।' মুসার গলা। কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি।

'রবিন কোথায়?'

'জানি না,' হাঁফাচ্ছে মুসা। 'ডগন্যাপারের সঙ্গে ছিল। তারপর কোনও গণ্ডগোল হয়ে গেছে।'

'সব গোলমাল হয়ে গেল,' বলল বিব্রত কিশোর। 'রাফিয়ানকে তো আমরা ফেরত পাই-ইনি, এখন রবিনও নিখোঁজ!'

'চোরটা নিশ্চয়ই রবিনকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারেনি,' বলল মুসা। 'এক কাজ করি এসো, তুমি প্ল্যাটফর্মের উত্তর দিকটা দেখো, আমি যাচ্ছি দক্ষিণ দিকটা খুঁজতে।'

মানসিক ভাবে দুর্বল বোধ করছে মুসা, যতোই জোর দিয়ে কথা বলুক না কেন। পার্শ্ববর্তী টিলার সারিতে দু'বার খুঁজেছে ও, রবিনের চিহ্নও দেখেনি। কিছু ফেলে যায়নি রবিন সূত্র হিসাবে। ওকে যে ধরে নিয়ে গেছে সে-ও কোনও চিহ্ন ছাড়াই উধাও হয়েছে। কিশোর চলে যাওয়ার পর একটা কথা মনে এলো ওর। রবিন কোথায় থাকতে পারে এখন মনে হয় আন্দাজ করতে পারছে ও।

গুহা! রকি বিচের টিলাগুলোতে গুহার কোনও অভাব নেই। ওগুলোর একটাতে হয়তো লুকিয়ে আছে রবিন। হয়তো ডগন্যাপারের হাতে ধরা পড়েনি ও।

গ্র্যানিটের টিলায় উঠবার সহজ একটা পথ খুঁজতে শুরু করল মুসা। বামদিকে টিলার গায়ে ঝোপের ভিতর দিয়ে সরু একটা পথ আছে। যদি

অবশ্য চোখের ভুল না হয়। ওদিকে এগোল ও। ঠিক তখনই পিছনে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। বন্যার স্রোতের মতো স্বস্তি অনুভব করল ও অন্তরে। নিশ্চয়ই রবিন।

মুসা ঘুরবার আগেই, একটা লোহার চেইন ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল। পিছন থেকে কেউ জোর টান দিচ্ছে। ভারসাম্য হারাতে শুরু করল মুসা। গলায় শক্ত হয়ে চেপে বসছে চেইনটা। শ্বাস আটকে আসছে। দু'হাতে চেইনটা গলা থেকে ছোটাতে চেষ্টা করল ও। আর তখনই একটা রুমাল চাপ দিয়ে ধরা হলো ওর নাকে। রুমালটায় কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। ছুটতে চেষ্টা করল মুসা, কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারি আচ্ছন্ন বোধ করল মুসা। চোখের সামনে দুনিয়াটা যেন চরকির মতো ঘুরছে। জ্ঞান হারাবার আগে ওর শেষ চিন্তা এলো, টিলা থেকে পড়ে গেলে মরতে হবে। তারপরই অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও।

তেরো

প্ল্যাটফর্মের উত্তর প্রান্তে চলে এসেছে কিশোর, কোনও লাভ হলো না। রবিন নেই এদিকে। এবার বৃত্তাকারে প্ল্যাটফর্মটাকে ঘিরে এগোল ও। দক্ষিণ দিকে পৌঁছেও মুসার কোনও দেখা পেল না। 'মুসা?' গলা চড়িয়ে ডাকল কিশোর। মুসা নিশ্চয়ই আশেপাশেই আছে। জবাব দিল না মুসা। বারবার ডাকল কিশোর, কোনও সাড়া নেই।

রবিন আর মুসা অদৃশ্য, রাফিয়ানও নিখোঁজ।

ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলল কিশোর, সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফিরে চলল রবিনের গাড়ির দিকে। ওটাতে মোবাইল ফোনটা আছে। ওখান থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে সাহায্য চাওয়া ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।

প্রথবার রিং হতেই রিসিভার তুললেন একজন পুলিশ অফিসার। তিনিই এই শিফটের অফিসার ইন-চার্জ। জানালেন চিফ ইয়ান ফ্লেচার বাড়ি ফিরে গেছেন ডিউটি শেষে। কিশোরের বক্তব্য শুনে বললেন.

পনেরো মিনিটের মধ্যে পার্কে পৌঁছে যাবেন তিনি দু'জন সার্জেন্ট নিয়ে।

ঠিক তেরো মিনিটের মাথায় স্কোয়াড কার নিয়ে হাজির হলেন তাঁরা। সরাসরি কাজের কথায় এলেন পুলিশ অফিসাররা।

'ঠিক কতোক্ষণ হলো রবিন আর মুসা নিখোঁজ হয়েছে?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'বিশ মিনিট।'

'তা হলে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজে দেখা যাক,' বললেন অফিসার ইন-চার্জ ওরাইলি। 'অফিসার রনসন, আপনি সিঁড়ির দু'পাশের টিলায় খোঁজেন। অফিসার জেমস, আপনি প্ল্যাটফর্মে খুঁজবেন। আমি আর কিশোর দেখব পার্কিং লট।'

পার্কিং লটের পুবদিকটা কিশোরের দেখা হয়ে গিয়েছে সেটা অফিসার ওরাইলিকে জানাল ও। দু'জন চলল পশ্চিম দিকে খুঁজে দেখতে।

পার্কিং লটের পশ্চিম দিকটা বড় বড় গাছ আর ঝোপ দিয়ে তিন দিক থেকে ঘেরা। মার্কারি লাইটের আলো কুয়াশার চাদর ছিন্ন করতে পারছে না। চারপাশে শুধু হলদে একটা আভা। রবিন পুব দিকের পার্কিং লটে গাড়ি রেখেছিল, কাজেই ডগন্যাপার হয়তো তার বাহন রেখেছে পশ্চিম দিকে। টর্চের দুর্বল আলোয় সতর্ক চোখে মেঝে দেখতে দেখতে চলল কিশোর। এমন কিছু ওর চোখে পড়ল না যা থেকে বোঝা যায় এদিকে গাড়ি রেখেছে চোরটা।

ক্লান্ত আর হতাশ লাগছে কিশোরের, কিন্তু বুঝতে পারছে এখন কোনওমতেই হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। হয়তো রবিন আর মুসার জীবন নির্ভর করছে সময় মতো ওদের খুঁজে বের করতে পারার উপর। অফিসার ওরাইলির পাশে পাশে হাঁটছে কিশোর, চারপাশে তাকাচ্ছে কোনও সূত্রের আশায়।

মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে বলে মনে হলো মুসার। চোখ মেলল ও। কিছু দেখতে পেল না। চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে কাপড় দিয়ে। মাথায় হাত দিয়ে তালু কতোটা ফুলেছে বুঝতে চাইল। পারল না। হাত-পা বেঁধে ঠাণ্ডা মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে ওকে।

মিষ্টি গন্ধওয়ালা রুমালটার কথা এবার মনে এলো ওর। আসলে মাথায় আঘাত করা হয়নি, ড্রাগ দিয়ে ওকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। সে-কারণেই এই তীব্র মাথা-ব্যথা।

আঁচড়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। রাগে গা জ্বলছে মুসার। জীবনে এই প্রথম বারবার ওদের উপর টেক্কা দিয়ে গেছে কোনও লোক। তা-ও লোকটা একটা কুত্তাচোর!

রবিনের কথা মনে এলো। রবিন কোথায়? রবিনই কি আঁচড়ের আওয়াজ করছে?

ডাকতে গিয়েও মত পরিবর্তন করল ও। কোথায় আছে জানা নেই ওর। আরও কে আছে তা-ও অজানা। ডগন্যাপার লোকটা ধারেকাছে থাকতে পারে। ডাকাডাকি না করে চুপচাপ থাকবে ঠিক করল ও, দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করবে।

দু'বার করে খোঁজা হলো পার্কিং লট, প্ল্যাটফর্ম আর দু'পাশের টিলার উপর। রবিন-মুসার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। ক্লান্ত বিধ্বস্ত কিশোরের অনুরোধের জবাবে অফিসার ওরাইলি বললেন, 'বুঝতে পারছি তোমার কেমন লাগছে, বাছা, কিন্তু এখানে বা আশেপাশে ওরা নেই। চিরুনি অভিযান চালিয়েছি আমরা। আর খুঁজে কোনও লাভ নেই। তবু যখন বলছ তো আরেকবার আমরা খুঁজব। তবে এবারই শেষ।'

তিন পুলিশ অফিসার পার্কিং লট আর সৈকতের দিকে গেলেন এবার। কিশোর আবার উঠল অবযার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে। এখানেই শেষ বারের মতো দেখা গেছে রবিন-মুসা আর ডগন্যাপারকে।

প্ল্যাটফর্মের গায়ে গা লাগানো টিলাগুলো বেশিরভাগ জায়গাতেই খাড়া উঠে গেছে অনেক উপরে। টিলার ধার দিয়ে হাঁটছে কিশোর। ঝোপটা দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। রুক্ষ টিলার গায়ে ওদিকে যেন সরু একটা পথ দেখা যায়, এদিকটা নেমে গেছে জমিনের দিকে! অবযার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে ঝোপের মাঝ দিয়ে পথটা ধরে এগোল ও।

টর্চের আলো ফেলে দেখল আরও বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ

আছে। একই লোকের পায়ের ছাপ। ওর আগেও পথটা ব্যবহার করেছে কেউ। কিছুটা সামনে রুপালি কী যেন একটা টর্চের হলদে আলোয় ঝিকিয়ে উঠল। সামনে বেড়ে ওটা তুলল কিশোর। চিনতে দেরি হলো না। জিনিসটা মুসার ঘড়ি।

শিউরে উঠল কিশোর। ঘড়িটা যেখানে পেয়েছে সেখান থেকে উঁচু টিলার কিনারা মাত্র আধফুট দূরে। তা হলে কি মুসা টিলা থেকে নীচের ওই পাথুরে সৈকতে পড়ে গেছে? তা হলে তো মৃত্যু নিশ্চিত!

দড়ির বাঁধন খানিকটা ঢিলে করতে পেরেছে মুসা। খুব দক্ষ হাতে বাঁধা হয়নি ওকে। আরও খানিক চেষ্টা করলে হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে পারবে ও।

আঁচড়ানোর আওয়াজটা আবার শুনতে পেল মুসা। আরও খানিক কসরত করার পর ডানহাতটা দড়ির গিঁঠ থেকে ছাড়াতে পারল ও। এখন পর্যন্ত কিডন্যাপারের উপস্থিতির কোনও আলামত টের পাওয়া যায়নি। হাতের বাঁধন খুলে চোখের বাঁধনটাও খুলল মুসা এবার। পায়ের বাঁধন খুলতেও দেরি হলো না।

প্রায়-অন্ধকার একটা ঘরে আছে ও। অতি সামান্য যে আলোটুকু আসছে সেটা আসছে কয়েকটা জানালার তক্তার ফাঁক দিয়ে আর নীল একটা ডীম লাইট থেকে। জানালার কাঁচ মনে হলো রং করা। জেসিকা স্প্রিংগারের গ্যারেজে আছে কি না ভাবল মুসা।

স্বল্প আলোয় চোখ সয়ে আসার পর একটা লনমোওয়ারের আবছা আকৃতি দেখতে পেল। একটা ওঅর্কবেঞ্চও আছে ঘরে। এবার অন্যদিকে তাকাল ও। ধূসর গাড়িটা দেখতে পেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ও, গাড়িটার চারপাশে এক চক্কর মারল। মাথার ব্যথাটা এখনও যাচ্ছে না। যা দেখবে ভেবেছিল তা-ই দেখতে পেল। গাড়িটার একটা দরজা হলদে রং করা।

গ্যারেজের কোনায় কী যেন নড়ে উঠল। বরফের মতো জমে গেল মুসা, তারপর সাবধানে ওদিকে মনোযোগ দিল। বিরাট একটা তারপুলিন দিয়ে কীসব যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। নড়ে উঠল তলার

জিনিসটা, তারপর গোঙানির আওয়াজ হলো। দ্রুত ওটার পাশে চলে গিয়ে ক্যানভাসটা সরাল মুসা। নীচে রবিন পড়ে আছে। ওর মতোই হাত-পা-চোখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে নথিকে। দ্রুত হাতে রবিনের বাঁধনগুলো খুলে ফেলল ও। জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা, রবিন?'

'মাথাটা গেছে,' বলল রবিন। 'ছিঁড়ে পড়তে চাইছে যেন! কোথায় আমি?'

'কারও গ্যারেজে,' জানাল মুসা। 'এখন বুঝতে পারছি আয়োলা মর্টন তার গাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের দেখতে দিতে চায়নি কেন।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, কিন্তু আবার আঁচড়ানোর আওয়াজটা শুনতে পেয়ে থেমে গেল। এবার আওয়াজটার পরপরই ভউ! হুফ! করে উঠল একটা কুকুর। পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। আওয়াজটা ওদের বড় বেশি পরিচিত।

রাফিয়ান!

চুরি যাওয়া কুকুরগুলোর খোঁজ এখন জানে ওরা।

'ওই ট্র্যাশব্যাগগুলোর পেছন থেকে আওয়াজটা এসেছে,' বলল রবিন।

ময়লা আবর্জনা মাড়িয়ে গ্যারেজের আরেক কোনায় চলে এলো দু'জন। খাঁচাগুলোর সামনে আগে পৌঁছোল মুসা। নয়টা খাঁচা। প্রত্যেকটাতে একটা করে কুকুর রাখা আছে। ঘুমাচ্ছে বেশিরভাগই। ওরা বুঝতে পারল ওগুলোকে ড্রাগ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

'চোরাই কুত্তা,' বলল রবিন। খাঁচার ভিতর হাত ঢুকিয়ে রাফিয়ানের মাথা চুলকে দিল। গরাদে আঁচড় কাটল রাফিয়ান, বের হতে চায়। ভউ! ভউ! করে জোরাল ডাক ছাড়ল পরপর কয়েকবার।

অন্য খাঁচার কুকুরগুলোও নড়েচড়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। শীঘ্রি বিভিন্ন জাতের কুকুরের ডাকে ভরে গেল গ্যারেজের ভিতরটা।

শুকিয়ে গেল রবিন-মুসার মুখ। ওদের যে ধরে এনেছে সে এতো চিৎকার ডাকাডাকি শুনে নিশ্চয়ই কী ঘটল তার খোঁজ নিতে আসবে।

রাফিয়ানের খাঁচার দরজা খুলে দিল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো রাফিয়ান, রবিনের বুকে দু'পা তুলে দিয়ে গাল চেটে দিল।

'রাফিয়ান ঠিক আছে,' পরম স্বস্তির সঙ্গে বলল মুসা।

দরজায় আওয়াজ পেয়ে ওর স্বস্তি উবে গেল। রবিন ঝট করে দরজার দিকে তাকাল। কে যেন দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়েছে! কিডন্যাপার! দ্রুত গ্যারেজের চারপাশে তাকিয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজল দুই গোয়েন্দা।

চোদ্দো

এতো ক্লান্তি লাগছে যে কিশোরের মনে হলো পার্কের কোনও বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। 'বাসায় যোগাযোগ করো, বলে দাও কোথায় আছো; আমরা চললাম,' বলে তৃতীয়বার খোঁজা শেষে বিদায় নিয়েছেন তিন পুলিশ অফিসার। কাল সকালে আবার তদন্ত শুরু করবেন। ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু এই মাঝরাতে এতো ঘন কুয়াশার মধ্যে তাঁদের আসলেই কিছু করার নেই।

হতাশ হয়েছে কিশোর, কিন্তু তাঁদের থাকতে অনুরোধ করতে পারেনি। বুঝতে পারছে, ওর-ও বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ফিরবে কী করে! কী করে কারও সামনে মুখ দেখাবে ও? বাবা-মাকে ওর বাড়িতে থাকবে বলে এসেছিল রবিন আর মুসা। এখন ওরা নিখোঁজ, হয়তো মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছে, আর ও ফিরে যাবে? তা হয় না।

একটা বেঞ্চে বসল কিশোর। অফিসার ওরাইলির বলা 'বাসায় যোগাযোগ' কথাটা বারবার ওর মনের ভিতর ঘুরেফিরে আসছে। মন বলছে কথাটা আগেও কোথাও শুনেছে ও। সত্যিই শুনেছে? কোথায়? কপাল টিপে ধরল কিশোর। মনে হচ্ছে দুনিয়াতে ও ছাড়া আর কেউ নেই। থমথম করছে গোটা পার্ক।

কুকুরচুরি রহস্য নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। সেই প্রথম থেকে কী-কী ঘটেছে একে একে মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখছে।

'বাসায় যোগাযোগ করো।'

এবার মনে পড়ল ওর। প্রথম যেদিন কোলি চুরির পর ডগ-হাউসে

গেল ওরা, তখন আয়োলা মর্টন ফোনে বাসায় যোগাযোগ করবে বলে খানিকক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিল। এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে। তরুণী বলেছিল বাড়িতে বাবা-মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করে বলবে সে কোথায় আছে। তাকে বাড়তি ডিউটি দিতে হবে সেটা জানাতে গিয়েছিল আয়োলা। কিন্তু পরে অন্য সময় কথায় কথায় বলেছিল চাকরিটা তার খুব দরকার, গাড়ির তেল, মেরামতির খরচ আর অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া দিতে পারা নিয়ে চিন্তিত ছিল। আরও একবার বলেছিল তার অ্যাপার্টমেন্টে ওরা যাতে না যায়, অ্যাপার্টমেন্ট অগোছাল। এখন কিশোর বুঝতে পারছে, আয়োলা চায়নি ওরা তার অ্যাপার্টমেন্টে যাক। গেলে ওরা বুঝে ফেলত বাবা-মাকে ফোন করার কোনও কারণ নেই আয়োলার। আসলে বাবা-মা'র সঙ্গে থাকেই না সে!

কোনও সন্দেহ নেই আয়োলা মর্টন মিথ্যে বলেছে।

যাকেই সে ফোন করে থাকুক, তার বাবা-মাকে করেনি।

করেছে ডগন্যাপারকে!

ওরা শ্যারনের বন্ধু জেনে খুব বিস্মিত হয়েছিল আয়োলা। সে-কারণেই সে ফোন করে। ফোন করে কুকর্মের সঙ্গীকে জানিয়ে দেয় ওরা তদন্ত করতে শুরু করেছে। নইলে অতো শীঘ্রি ওদের পিছু লেগে যেতে পারত না ডগন্যাপার। রাফিয়ানের দায়িত্ব ওরা নিয়েছে সেটাও বোধহয় জানিয়েছে। তারপর ডগন্যাপার ওদের অনুসরণ করে স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে যায়। ওখান থেকে রাফিয়ানকে চুরি করে।

কিন্তু কেন?

উত্তরটা সহজ। আয়োলা মর্টন যেই বুঝল ওরা কোলিটা খুঁজবে, তখনই বুঝতে পারল বিপদে পড়ে যেতে পারে সে। তিন গোয়েন্দার সুখ্যাতি ভাল করেই জানত সে। কুকুর চুরি পুলিশ হয়তো তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেবে না, কিন্তু তিন গোয়েন্দা বান্ধবীর খাতিরে আপ্রাণ চেষ্টা করবে চোরকে ধরার। আয়োলা চিন্তা করেছে কী করে তিন গোয়েন্দাকে এই কেস থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। রাফিয়ানকে চুরি করলে ওদের হুমকি দেওয়া যাবে যাতে তদন্ত বন্ধ করে। কিন্তু কিছু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। নইলে...ব্যাপারটা এখন কুকুর চুরির

চেয়ে অনেক বড় ধরনের অপরাধে পরিণত হয়েছে। কিডন্যাপ করা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। কিডন্যাপিঙের শাস্তি অত্যন্ত গুরুতর।

পার্কে যা ঘটল সেটা মনের ভিতর নাড়াচাড়া করল কিশোর। পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হলো কেন? রবিন বা মুসা কি ডগন্যাপারকে চিনে ফেলেছিল? সে-কারণেই ওদের ধরে নিয়ে গেছে?

বেঞ্চ ছেড়ে উঠল কিশোর, রবিনের গাড়ির কাছে ফিরে এলো। ইগনিশনে চাবি রেখেই বেরিয়েছিল রবিন। গাড়িটা স্টার্ট দিতে অসুবিধে হলো না। সোজা ডগ-হাউসের দিকে ছুটল রবিনের ফোক্সওয়াগেন। গম্ভীর চেহারায় গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর। এখনও অনেক সুতো জোড়া লাগছে না, তবে এটা নিশ্চিত যে, রবিন আর মুসার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে আয়োলা মর্টনের সম্পর্ক আছে।

রবিন-মুসা লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করে পা বাড়াতে পারার আগেই খুলে গেল দরজা। বাইরে থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল গ্যারেজের ভিতর। ভিতরে ঢুকল লোকটা। এখনও তার মুখ ঢেকে রেখেছে রাবারের সেই মুখোশ। হাতে একটা পিস্তল! তাকে দেখেই বিপদ বুঝে ছোট একটা টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকেছে রাফিয়ান।

পিস্তলটা রবিন আর মুসার মাঝখানে তাক করে ধরল কিডন্যাপার, গম্ভীর গলায় ধমকে উঠল, 'খবরদার! কোনও চালাকি নয়! একটু নড়েছ কী মরেছ!' পিস্তল নাড়াল সে। 'এবার যা বলছি, করো!'

লোকটার নির্দেশে রবিনের হাত-পা আবার বাঁধতে হলো মুসাকে। এক হাতে পিস্তল তাক করে টেপ দিয়ে মুসার কব্জিদুটো বেশ কয়েক প্যাঁচ দিয়ে আটকে দিল লোকটা। কাজ সেরে মুখোশের ভিতর খিকখিক করে হাসল। 'ভেবেছিলে পার পেয়ে গেলে, না? এতো সহজ নয়!'

'আপনি কি পাগল হলেন?' বলল মুসা। 'কুকুর চুরি এক কথা আর কিডন্যাপিং সম্পূর্ণ আরেক। ধরা আপনি পড়বেনই। আর তখন ভীষণ কড়া শাস্তি হবে।'

'দোষটা তোমার বন্ধু রবিনের,' বলল মুখোশ পরা লোকটা। 'ও যদি টাকাগুলো আপোষে দিয়ে দিত তা হলে আমি জানিয়ে দিতাম কোথায়

রাফিয়ানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু টাকা হাতছাড়া করতে চাইল না ও। তারওপর মুখোশে টান দিল। হয়তো চিনে ফেলেছে, কাজেই ওকে টাকাসুদ্ধ ধরে আনতে হলো।'

'শীঘ্রি জেলে পচে মরবেন আপনি,' বলল রবিন।

'অসম্ভব!' খিকখিক করে হাসল মুখোশ পরা লোকটা। 'সাক্ষ্য দেবে কে আমার বিরুদ্ধে? ছোটখাটো কয়েকটা কাজ সেরে নিই, তারপর সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে সরে পড়ব আমি।'

'আপনার সঙ্গীনিকে ফেলেই চলে যাবেন?' চট করে প্রশ্ন করল মুসা।

'ওর...' থেমে গেল কিডন্যাপার, তারপর প্রশংসার সুরে বলল, 'ভেরি গুড, মুসা আমান। আমাকে প্রায় বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে।...যাক, তাতে কিছু আসবে যাবে না। আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা রাখোনি তোমরা। এখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে আমাকে।'

'কী বলতে চান?' শঙ্কিত বোধ করতে শুরু করল মুসা। হাতের প্ল্যাস্টিকের টেপ খুলতে চেষ্টা করে দেখল, কাজটা অসম্ভব।

'সত্যিই আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই,' যেন আপন মনে বলছে কিডন্যাপার, 'তোমাদের চিরতরে গায়েব করে দিতে হবে এখন।'

পনেরো

'এখন সুখবর হচ্ছে, কুকুরগুলো আপাতত বাঁচবে,' ঠাট্টার সুরে বলল পিস্তলধারী কিডন্যাপার। 'আর দুঃসংবাদ হচ্ছে, মরতে হবে তোমাদের দু'জনকে।'

রবিন চুপ করে শুনছে লোকটার কথা। মুসা চিন্তা করে দেখল, লোকটাকে যদি কথা বলিয়ে সময় আদায় করা যায়, তা হলে হয়তো বাঁচার একটা সুযোগ ওরা পেতেও পারে। বাঁচার কোনও না কোনও পথ

নিশ্চয়ই আছে!

'একটু পরই পুলিশ নিয়ে এখানে চলে আসবে কিশোর,' জোর দিয়ে মিথ্যেটা বলল মুসা।

'তোমাদের বন্ধু জানেও না তোমরা কোথায় আছো,' তার সেই খিকখিকে হাসি হাসল কিডন্যাপার।

কথাটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তিক্ত মনে ভাবল মুসা। ওদিকে রবিন লোকটার গলার আওয়াজ থেকে পরিচয় চেনার চেষ্টা করছে। লোকটা কি হ্যারল্ড মুর? মনে তো হচ্ছে না। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আর এই জায়গাটা জেসিকা স্প্রিংগারের গ্যারেজও হতে পারে।

'কুকুর চুরি শুরু করলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

দেহের ভর এক পায়ে চাপাল কিডন্যাপার। 'তোমাদের বলা যায়, তোমরা তো আর অন্য কাউকে কখনও বলতে পারবে না। খবরের কাগজে পড়েছিলাম ব্রিডাররা ল্যাবগুলোকে কুকুর সরবরাহ করে প্রচুর রোজগার করে। চিন্তা করে দেখলাম আমিও কাজটা করতে পারি। কিন্তু ব্রিডিং শুরু করার মতো টাকা ছিল না আমার। সহজ পথটাই বেছে নিলাম। চুরি করতে শুরু করলাম কুকুর। এরমধ্যেই ছয়টা ল্যাবের সঙ্গে চুক্তিও হয়ে গেছে আমার। তোমাদের খতম করে দিয়েই চলে যাব কাছের একটা গ্রামে। কেউ জানতেও পারবে না আমার মতো এক ভয়ঙ্কর খুনি গ্রামে চলে যাবে।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'জানো একেকটা কুকুর বিক্রি থেকে কতো পাবো আমি? এক হাজার ডলার! রীতিমতো বড়লোক হয়ে যাব। আর তা যদি হতে না-ও পারি, যদিও তার সম্ভাবনা নেই, তবু কুকুরের খাঁচা পরিষ্কার করার চেয়ে এ-কাজটা অনেক ভাল। রকফেলার এক লাখেই কোলি ফেরত নেবে আশা করি। অন্যগুলোও বিকিয়ে যাবে ভাল দরে।'

লোকটা থামতেই রবিন মুসার দিকে তাকাল। 'মুসা, কুকুরের খাঁচা পরিষ্কার করার কথা বলেছে, এর মানে বুঝেছ? পায়খানা পরিষ্কার! এখন বুঝতে পারছ কে কিডন্যাপার?'

'মিস্টার মিলহিজার, পার পাবেন না আপনি,' শীতল স্বরে বলল

মুসা।

ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেল মুখোশধারী, তারপর মুখোশটা একটানে খুলে ফেলল। 'ঠিক আছে, তোমাদের বুদ্ধি আছে মানছি। ভালই হলো, মুখোশটা আর পরে থাকতে হবে না। এমনিতেই ওটা পরে গরমে হাঁসফাঁস করছিলাম। এবার আমি যাচ্ছি, একটা ফোন করতে হবে। কাজটা সেরেই ফিরে আসব তোমাদের ব্যবস্থা করতে। সত্যি আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা রাখোনি তোমরা।' পিছিয়ে গেল নিক মিলহিজার, তারপর দরজাটা বন্ধ করে তালা মেরে দিয়ে চলে গেল।

ডগ-হাউসের পোর্টিকোর নীচে রবিনের গাড়ি যখন থামাল কিশোর, তখন মাত্র পুবাকাশে মুখ তুলেছে সূর্য। অফিসের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, প্রায় ছুটে বের হলো আয়োলা মর্টন। পোর্টিকোতে গাড়িটা যেন খেয়ালও করল না। কাকে যেন কী সব বলতে বলতে ছুটছে তরুণী। গাড়ির কাঁচ নামাল কিশোর তার কথা শুনবার জন্য। ভিতরের কারও কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে আয়োলা, বলছে অত্যন্ত জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় এক্ষুনি তাকে বাড়ি যেতে হচ্ছে।

সিটে নিচু হয়ে বসল কিশোর, যাতে ওকে দেখতে না পায় আয়োলা মর্টন। তরুণী খানিকটা দূরে চলে যাবার পর মাথা তুলল ও। খুব তাড়াহুড়ো করে ছুটছে তরুণী। সে ডগ-হাউস ভ্যানে চড়ে বসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর ভ্যানটা রাস্তায় নামার পর অনুসরণ শুরু করল। বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখল, যাতে ও পিছু নিয়েছে সেটা সহজে টের না পায়। রবিনের গাড়ির রংটাও ওকে সাহায্য করছে। এই গাড়িটা আয়োলা মর্টন আগে দেখেনি।

ধৈর্য ধরে পিছু লেগে থাকল কিশোর। বুঝতে পারছে আয়োলা মর্টন ওকে রবিন আর মুসার কাছে পৌঁছে দেবে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ওর। মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করলে কেমন হয়? পুলিশে যদি ফোন করে ও?

প্রথবার রিং হতেই ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার ধরলেন। আধমিনিট

কিশোরের বক্তব্য শুনেই বললেন, 'তুমি পেছনে লেগে থাকো। কোন্ স্ট্রিটে আছো বলো, আমি ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করছি।'

'লাইমস্টোন স্ট্রিট, সার। মে ফ্লাওয়ারের দিকে যাচ্ছি।'

'আমি ওয়্যারলেস করে দিচ্ছি।' লাইন কেটে গেল।

'এতো তাড়াতাড়ি আপনার কাজ শেষ হয়ে গেল?' নিক মিলহিজার ফিরতেই শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব না দিয়ে পিস্তলটা কোমরে গুঁজল মিলহিজার। বলল, 'এটা একটা খেলনা পিস্তল ছিল। যদি আগে জানতে তা হলে আমাকেই বরং বন্দি করে ফেলতে পারতে তোমরা। কিন্তু আফসোস, তোমরা ধরতে পারোনি।' এবার পকেট থেকে ছোট একটা চামড়ার থলে বের করল মিলহিজার। ওটা থেকে সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুল বের হলো। 'সোডিয়াম পেনটোবারবিটাল,' বলল মিলহিজার। 'আধ অ্যাম্পুল ইঞ্জেক্ট করলেই চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বে তোমরা। আর কখনও সে-ঘুম ভাঙবে না।'

'খুন করবেন আপনি আমাদের?' অবিশ্বাস ঝরল মুসার কণ্ঠে। হাতের টেপ অনেকখানি ঢিলে করে ফেলেছে ও। আর সামান্য সময় পেলেই হাত দুটো মুক্ত করতে পারবে। 'খুনের শাস্তি জানেন? মৃত্যুদণ্ড! ইলেকট্রিক চেয়ার।'

'আমি চলে যাচ্ছি ধরাছোঁয়ার বাইরে, ছোকরা। অনেকবার অনেক ভাবে তোমাদের ভয় দেখিয়ে ঠেকাতে চেয়েছি। এমনকী আমার সেরা সংগ্রহ ভয়ঙ্কর পিট বুল কুকুরটাকেও ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে লেলিয়ে দেয়ার জন্যে রেখে এসেছি ওয়্যারহাউসের ভিতর। শুধু তা-ই না, মরিচের গ্যাস, গায়ের ওপর খাবারের বস্তা ফেলা, কুকুরের খাঁচায় আটকানো–কী না করেছি। তারপরও নাছোড়বান্দা ছোকরা তোমরা শিক্ষা নিলে না।' ভয়ঙ্কর হাসি হাসল নিক মিলহিজার। অ্যাম্পুল থেকে সিরিঞ্জে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ তরল ভরল। 'শেষ কথা কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো। ওষুধটা খুব দ্রুত কাজ করে কিন্তু।' মুসা আর রবিনের শুকনো মুখ দেখল মিলহিজার। 'ভয় নেই, একদম ব্যথা পাবে না।'

দু'পা এগোল সে, তারপর থমকে দাঁড়াল। এতোক্ষণে তার খেয়াল

হয়েছে একটা খাঁচা খোলা। ওটাতে কুকুর নেই।

'তোমাদের রাফিয়ান কই?'

টেবিলের তলা থেকে উঁকি দিল রাফিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে রবিনও চিৎকার করল, 'ছুঃ, রাফিয়ান!'

একটা তীরের মতো ছুটে বের হলো রাফিয়ান, পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিক মিলহিজারের উপর। সোজা লোকটার বুকে দু'পা তুলে দিল ও। সেই সঙ্গে বিকট ভউ! ভউ! করছে।

মিলহিজার এরকম কিছু ঘটবে ভাবতেও পারেনি। হঠাৎ রাফিয়ানের ওজনটা সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে। আর ঠিক তখনই এক ঝটকায় টেপ ছুটিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। নিক মিলহিজার উঠবার সময় পেল না, মুসা পৌঁছে গেল তার পাশে। ধাক্কা দিয়ে তাকে উপুড় করেই পিঠে চড়ে বসে লোকটার দু'হাত ভাঁজ করে ধরে ঠেলল ও কাঁধের দিকে। ব্যথায় আঁউ করে একটা শব্দ বের হলো মিলহিজারের মুখ দিয়ে। এদিকে রাফিয়ান তার গাল চেটে দিচ্ছে।

উঠবার চেষ্টা করল মিলহিজার, পারল না। হালকা-পাতলা লোক সে, তা ছাড়া মুসার মতো কারাতেও জানে না, অসহায় ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল। খানিকক্ষণ পর ব্যথায় বিকৃত স্বরে বলল, 'বদামাশ ছোকরা, আমার হাত ভেঙে যাচ্ছে!'

'ভাঙতে দিন, খুব বেশি ব্যথা লাগবে না। অন্তত মরার চেয়ে তো ভালো!' নির্বিকার গলায় বলল মুসা। 'আরেকটু হলেই তো আমাদের খুন করছিলেন!'

'পাগল না কি!' প্রায় আঁতকে উঠল এবার মিলহিজার। 'ভয় দেখাচ্ছিলাম। খুনখারাপি করে মরব না কি!'

'তা হলে অ্যাম্পুলের ওষুধটা?'

'তরল রিভোট্রিল। ঘুমিয়ে পড়তে তোমরা। আমি পরে পুলিশকে ফোন করে জানিয়ে দিতাম তোমাদের কোথায় পাওয়া যাবে।' আবার উঠবার চেষ্টা করল মিলহিজার। 'ছাড়ো বলছি, বদমাশ ছেলে! ছেড়ে দাও! কথা দিচ্ছি আমি চলে যাব। খোদার কসম!'

'যাবেন তো বটেই,' বলল রবিন। 'তবে যাবেন আসলে জেলে।

মানুষের কুকুর চুরির অপরাধে।'

'রবিন,' ডাকল মুসা। 'গড়িয়ে চলে এসো দেখি এদিকে, তোমার হাতের বাঁধন খুলে দিই। একে এক হাতেও আটকে রাখতে পারব এই হোল্ডে।'

কসরত শুরু করল রবিন, মিনিট পাঁচেক পর চলে আসতে পারল নিক মিলহিজারের পাশে। এক হাতে মিলহিজারের দুই কব্জি শক্ত করে ধরে আরও উপরের দিকে ঠেলল মুসা। 'বাপরে!' বলে কাতরে উঠল মিলহিজার। মুসা অন্য হাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রবিনের বাঁধন নিয়ে। ভাল করে বাঁধেনি ও বাঁধবার সময়। মিলহিজারও পরীক্ষা করে দেখেনি। আধ মিনিট লাগল রবিনের হাতের বাঁধন খুলে দিতে। পায়েরটা রবিন নিজেই খুলল। প্রথমেই রাফিয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও, তারপর দড়িগুলো দিয়ে আচ্ছামতো বাঁধল নিক মিলহিজারকে।

দু'জন উঠে দাঁড়াল ওরা, ঠিক তখনই দূরে শুনতে পেল পুলিশের গাড়ির সাইরেন। দ্রুত কাছে চলে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। ঠিক যেন গ্যারেজের দরজার সামনেই থামল কয়েকটা গাড়ি।

দরজা খুলে বাইরে তাকাল রবিন-মুসা, দেখল পুলিশের গাড়ি থেকে নামছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। একজন পুলিশ অফিসার হাতকড়া পরানো আয়োলা মর্টনকে ধরে নামালেন। রবিনের ফোক্সওয়াগেন থেকে নামল কিশোর।

গ্যারেজের ভিতর ঢুকল সবাই। রবিন-মুসাকে নিরাপদ দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল কিশোর।

আয়োলা মর্টনকে দেখেই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল মিলহিজারের, বলে উঠল, 'গাধী! সঙ্গে করে পুলিশ নিয়ে এসেছ! তোমার কথায় যদি এই বদমাশ ছোকরাদের না ঘাঁটাতাম তা হলে এখন হয়তো নিশ্চিন্তে থাকতাম আমি। ওদের নেড়ি কুত্তাটাকে চুরি করতে বলেই আমার সর্বনাশ করলে তুমি।'

'কী! আমি বলেছি!' ফুঁসে উঠল আয়োলা মর্টন। 'আর তুমি? তুমি দুধে ধোওয়া তুলসি পাতা? মুক্তিপণ চাইলটা কে? আমি ডগ-হাউস থেকে কুকুর চুরি করতে মানা করেছিলাম না? এহ্! বাহাদুর! কিছু হবে

না বলে! বলেছিলাম না শ্যারন মেয়েটা তিন গোয়েন্দার বন্ধু, তাকে ঘাঁটালে ধরা পড়ে যাব আমরা!'

'আপনিই তালায় আঁচড় কেটেছিলেন, মিলহিজার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

আস্তে করে মাথা দোলাল নিক মিলহিজার ফ্যাকাসে মুখে। 'পুলিশ মনে করেছিল তালাটা জোরাজুরি করে খোলা হয়েছে।'

'আর আপনি, আয়োলা,' তরুণীর দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনি হুমকি দিয়ে ডগ-হাউসে ফোন আসে বলেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যে? গাড়ি নষ্ট সেটাও নিশ্চয়ই বানানো কথা?'

'আমি আমার দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি,' পরাজিতের মতো বলল আয়োলা মর্টন।

'আর আপনি আমাদের গাড়ি সার্চ করেছিলেন, মিলহিজার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। পিট বুলটাকে ওয়্যারহাউসে সামলাতে গিয়ে এক্সেলসিওর ল্যাবের কার্ডটা পড়ে গিয়েছিল, ওটা খুঁজছিলাম।' একটু থামল মিলহিজার, তারপর বলল, 'দেখো, আমাদের দোষগুলো বড় কিছু নয়। কয়েকটা কুকুর শুধু চুরি করেছি আমরা।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন ইয়ান ফ্লেচার। এতোক্ষণ কথা শুনছিলেন। 'ভুল বললে তুমি, মিলহিজার। মুক্তিপণ চেয়ে বড় অপরাধ করেছ তোমরা, তারপর কিডন্যাপ করেছ রবিন আর মুসাকে। এগুলো মারাত্মক অপরাধ। আমি জানতে চাই ওদের কিডন্যাপ করলে কীভাবে।'

হাল ছেড়ে দিল নিক মিলহিজার, স্বীকারোক্তির সুরে বলল, 'রবিন যখন টাকা হাতছাড়া করতে রাজি হলো না, তারওপর আমার মুখোশ ধরে টান দিল তখন ভাবলাম আমাকে চিনে ফেলেছে। বাধ্য হয়ে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে টিলার কাঁধে রাখলাম। পরে একই ভাবে মুসাকেও অজ্ঞান করলাম। তারপর এক এক করে বয়ে নিয়ে আয়োলার ট্রাকে তুলে নিয়ে এলাম এখানে এই পড়ো বাড়িটাতে। মাছ ধরতে গেলে এখানে থাকি আমি। অনেকদিন ধরেই বাড়িটা আমি মাঝে

মাঝে ব্যবহার করি। আশেপাশে লোকালয় নেই, কাজেই কারও চোখে পড়ে যাবার ভয় ছিল না। আমি ঠিক করি ওদের ঘুম পাড়িয়ে কুকুরগুলো নিয়ে বোটে করে আমার গ্রামে চলে যাব। কাছেই ওটা। পরে সময় সুযোগ মতো কুকুরগুলো বিক্রি করব। সম্ভব হলে রকফেলারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করব। কথা ছিল আমি গ্রামে চলে যাওয়ার পর আয়োলাও চলে যাবে ওখানে, বিয়ে করব আমরা।'

'অনেকগুলো ভুল করেছেন আপনারা,' বলল কিশোর। 'কেননে চোরাই কুকুর রাখা ঠিক হয়নি। জেসিকা স্প্রিংগারের চোখে তো ধরা পড়েছেনই, আমি মিসেস লেবউফকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ওখানে যেসব কুকুর রাখা হয় সেগুলোর কাগজ পত্র সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা হয়ে যায়। অথচ আয়োলা বলেছিলেন পরে তিনি বাড়তি কুকুরগুলোর মালিকের নাম লিখবেন। এ ছাড়াও, আপনার এখানকার আনসারিং মেশিনেও একটা মেসেজ পাঠাই আমি। ওটা ট্রেস করলেও পুলিশ বুঝে যাবে আপনিই ল্যাবোরেটরিতে কুকুর বিক্রি করতে চাওয়া সেই লোক।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল রবিন। 'এখানে আপনার গাড়ির চাকার দাগ আঁকা আছে। ওয়্যারহাউসে এঁকেছিলাম। এটা মিলালেই জানা যাবে আসলে আপনিই সেদিন রাফিয়ানকে চুরি করেছিলেন।'

'তবে এসবের দরকার পড়বে না,' বললেন ইয়ান ফ্লেচার। 'অনেকদিন ধরে পুলিশে আছি, আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়, তা হলে এরা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ কোর্টে স্বীকার করে নেবে। তাতে শাস্তি কম হবে এদের।'

'তা-ই করব আমি,' বলল মিলহিজার।

'আমিও,' তাড়াতাড়ি বলল আয়োলা মর্টন।

'তা হলে তো আর কথাই থাকে না,' বললেন ইয়ান ফ্লেচার। 'এই কেস সল্‌ভ্‌ হয়ে গেল।' অফিসারদের ইশারা করলেন তিনি। 'কুকুর গুনে দেখো সবগুলো আছে কি না। ওগুলো ওগুলোর মালিকদের ফেরত দিতে হবে।'

'আমাদের টাকা আছে নিক মিলহিজারের কাছে,' বলল কিশোর।

'এক হাজার ডলার।'

সার্চ করা হলো মিলহিজারকে, টাকাগুলো পেয়ে কিশোরের হাতে তুলে দিলেন চিফ ইয়ান ফ্লেচার।

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে ওদের। পুলিশ চিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাফিয়ান সহ রবিনের ফোক্সওয়াগেনে উঠল ওরা, রবিন ওদের নিয়ে চলল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

ওরা পৌঁছে মুখ-হাত ধুয়ে মাত্র নাস্তা নিয়ে বসেছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলল কিশোর। শ্যারন দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে। ওর পাশেই হাস্যোজ্জ্বল জিনা। কিশোরের বুঝতে দেরি হলো না, নিজে রাফিয়ানের নিখোঁজ সংবাদ না দিয়ে জিনাকে সঙ্গে করে এনেছে শ্যারন, যাতে ওকে জিনার রাগ সামলাতে না হয়।

'ইশ্, মনে হচ্ছে রাফিয়ানকে কতোদিন দেখি না,' কিশোর সরে দাঁড়াতেই ঘরের ভিতর ঢুকল জিনা। 'রাফিয়ান কোনও শয়তানি করেনি তো?'

শ্যারন অসহায় দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল।

মুচকি হেসে কিশোর বলল, 'এক ফোঁটাও না। ও আছে তা প্রায় টেরই পাইনি আমরা!' শ্যারনের দিকে ফিরল কিশোর। 'এখন বিশেষ কারণে আমার মনে হচ্ছে মিস্টার লেবউফ লজ্জা পাবেন তোমাকে চাকরি থেকে ছুটিয়ে দিয়েছেন বলে। তিনি যদি অনুরোধ করেন, তা হলে আবার তুমি ওই মোটেলে চাকরিটা নেবে?'

'অসম্ভব!' বলল শ্যারন। 'ভদ্রলোক শেষদিকে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। রাফিয়ানের কারণে তখন তখনই চাকরি ছাড়তে পারিনি।'

'কী বলছ এসব?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'বলার মতো কিছু নয়,' হালকা চালে বলল কিশোর।

এ ক'দিনে কী ঘটেছে জানতে হলে রবিনের নথি পড়তে হবে জিনাকে। কিন্তু সেটা কি পড়তে দেবে রবিন? তা হলে জিনা জেনে যাবে ওকে আর কিশোরকে কুকুরের খাঁচায় বাস করতে হয়েছিল!

***

অরণ্যের প্রতিশোধ

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

বাঁ হাত চেপে ধরে এক ছুটে রান্নাঘরে ঢুকলাম। হাতের তালু থেকে বেরিয়ে আছে একটা রেযর ব্লেড। ব্লেডের চারপাশ ঘিরে রক্ত, আমার কব্জি থেকে চুইয়ে পড়ছে সরু ধারায়।

'চাচী!' মুখ বিকৃত করে হাতটা তুলে ধরলাম।

আমার হাতের দিকে এক ঝলক চাইল মেরি চাচী, তারপর আবারও চুলোয় চাপানো গরুর মাংসের প্যানে চোখ ফিরাল।

'বেশ ভাল দেখাচ্ছে। তবে এবার নিশ্চয়ই সব কেচাপ শেষ করিসনি?'

হতাশায় গুঙিয়ে উঠলাম। চাচীর হয়েছেটা কী? কিচেন লাইটের আলোয় ঝিকোচ্ছে রেযর ব্লেডটা।

ওটা গেঁথে রয়েছে আমার হাতে। ব্যথায় জান যাচ্ছে আমার।

'চাচী, এবারেরটা কেচাপ নয়, সত্যিকারের রক্ত!' কব্জি চেপে ধরলাম যাতে ফ্যাকাসে হয়ে যায় হাত, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম।

চকিত চাউনি বুলাল চাচী।

'হাত ধুয়ে খেতে বস।'

'চাচী, রক্ত পড়ে মারা যাচ্ছি আমি!' টলে উঠে বললাম।

এ সময় হাসি মুখে কিচেনে প্রবেশ করল রাশেদ চাচা।

'কীরে, তোর হাতে কী?'

হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। সাদা মেঝেতে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।

'চাচা, হাত কেটে ফেলেছি!'

আমার কাছে এসে হাতটা নিজের হাতে নিল চাচা।

'হুঁ, খুব খারাপ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। আয় অপারেশন করে

দিই!' আমাকে টেনে নিয়ে এল কিচেন কাউন্টারের কাছে। তারপর এক টানে ড্রয়ার খুলে একটা ঝকঝকে ছুরি বের করল।

'চাচী!' চেঁচিয়ে উঠলাম। শরীর মুচড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চাচা ছাড়ল না। ছুরিটা দোলাচ্ছে। ঝলসে উঠল ফলাটা। 'চাচী!' চেঁচালাম আবারও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাচী ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে।

'চাচী এবার তোকে বাঁচাতে পারবে না!' চোখ বিস্ফারিত চাচার। আমি সত্যি ছুটতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কিচেন কাউন্টারে আমার বাহু চেপে ধরল সে। 'কব্জির কাছ থেকে কেটে ফেলতে হবে।' মাথার উপরে ছুরিটা সাঁই করে তুলে ধরল।

ছুরিটার দিকে চাইলাম। চাচা হঠাৎই হেসে উঠল।

পড়ে গেল ছুরিটা।

কাঠের কাউন্টারে এতটাই জোরে গেঁথে গেল, চমকে উঠলাম আমি। হেসে ফেলল চাচা।

'ডিনার তৈরি। খুনোখুনি বাদ দিয়ে খেতে এসো,' এসময় ডাকল চাচী।

চাচীর দিকে চাইলাম আমরা। দু'বাহু ভাঁজ করে রেখেছে বুকের কাছে। এক হাতে বার্গার-টার্নার ধরা।

চাচা আমার উদ্দেশে চোখ টিপে, ছুরিটা সরিয়ে রাখতে গেল।

'ওটা আর আমার নাইফ ড্রয়ারে রেখো না,' চাচী বলল। 'গাজর কাটতে গিয়ে রক্ত চলকে বেরোক চাই না আমি।' হেসে ফেললাম আমি। এবার আমার দিকে দৃষ্টি পড়ল চাচীর। 'ডিনারের পর সব কাজ সারবি। তারপর আটটার আগে হোমওয়র্ক করে ফেলা চাই, বুঝলি?'

ঘাড় কাত করে সায় জানালাম। কিচেন থেকে বেরিয়ে বাথরুমে গেলাম হাত ধুতে।

চাচীর কাছে কোনও পাত্তাই পেলাম না। পুরো একটা ঘণ্টার চেষ্টা পানিতে গেল।

ব্লেডটা আসল না, রবারের। তবে দেখতে একদম আসলের

মতন। ফলায় রূপালী-ধূসর রঙ মাখিয়ে কোনাগুলোকে দেখতে চকচকে আর ধারাল করে তুলেছিলাম। অপর প্রান্তটা এমনভাবে কেটে ফেলেছিলাম, দেখে যাতে মনে হয় আমার হাতে গেঁথে গেছে। স্পিরিট গ্লু দিয়ে আটকে রেখেছিলাম। কর্ন সিরাপ আর রেড ডাই ছিল বিকল্প রক্ত হিসেবে।

এসবই রাশেদ চাচার জিনিস। চাচা ইদানীং ছায়াছবির স্পেশাল এফেক্টসের কাজ করছে।

একটু পরে, ডিনারে বসলাম আমরা।

'এবারের হ্যালোউইনে কী কস্টিউম চাস তুই?' জিজ্ঞেস করল চাচা।

'খাওয়ার সময় বিরক্তিকর আলোচনা না করলে হয় না?' বলল চাচী।

হেসে ফেলল চাচা।

'এবার নতুন কিছু চাই আমি,' সোৎসাহে বলে উঠলাম। 'নিজেই কিছু একটা করব। এমন কিছু যাতে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা দেখে ভিরমি খায়।' আমি আসলে বিচিত্র কিছু একটা করে এমনকী চাচাকেও চমকে দিতে চাই।

'তোমার কী মনে হয়, ও পারবে নিজের আইডিয়া দিয়ে তোমাকে ভয় দেখাতে?' চাচী জিজ্ঞেস করল।

চাচা চাইল চাচীর দিকে।

'পারা তো উচিত, ডিনার খেয়ে নে, আমি তোকে কিছু স্কুইব দেখাব। তারপর দু'জনে মিলে আলোচনা করে কিছু একটা আইডিয়া বের করে ফেলব।'

দুটো সবুজ বিন জোর করে গিললাম। তারপর প্লেটটা নিয়ে গেলাম সিঙ্কের কাছে। গার্বেজ ডিসপোসালে এঁটো-কাঁটা ফেলে চাচার স্টাডির দিকে পা বাড়ালাম।

'কই যাস?' চাচীর কণ্ঠ থামিয়ে দিল আমাকে। 'কাজগুলোর কী হবে?'

ঘুরে দাঁড়ালাম।

'ওহ, চাচী, চাচা আমার জন্যে বসে আছে।'

'আর আমি সারা বিকেল বসে আছি তুই কাঠ নিয়ে আসবি বলে। আগুন নেই, টোস্টেড মার্শম্যালোও নেই,' সাফ জানিয়ে দিল চাচী।

আমি মার্শম্যালো পছন্দ না করলেও চাচা করে। কাজেই রাজি হতে হলো।

'ঠিক আছে, যাব।'

পিছনের উঠনে চলে এলাম। বিস্তর আগাছা জন্মেছে। চাচা মো করার সময় পায় না, কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত, আমার দু'এক সপ্তাহ লেগে যাবে আগাছা সাফ করতে।

উঠনে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গাছের পাতা। স্ট্রীটলাইটের হলদে আলো এখান অবধি পৌঁছয়নি। পিছনের বারান্দায় বাতিটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে কুয়াশা। ধূসর আঙুল দিয়ে যেন সব কিছু আঁধার আর স্যাঁতসেঁতে করে তুলেছে।

ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলাম। বাতাসের দোলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল কুয়াশা। শুকনো পাতা খটখটিয়ে উঠল শুকনো হাড়ের মতন। বুকের কাছে দু'বাহু ভাঁজ করে কাঠের গাদার উদ্দেশে এগোলাম।

চাচা ক'দিন আগে ট্রাক ভর্তি কাঠ এনেছে। আমাদের সাধারণত কাঠের দরকার হয় না। কিন্তু আজকে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ফলে, চাচী চাইছে চাচার স্টাডিতে আগুন জ্বেলে, কিছু একটা পড়বে-টড়বে। আর আমি দেখব চাচা কী করে।

পাতার স্তূপে পা চালালাম। পাতা ভেদ করে চলে গেল পা। আগাছা ঘষা খেল আমার জিন্সে, মনে হলো আঁকড়ে ধরতে চাইছে বুঝি। চারদিক নিঃশব্দ। হৃৎস্পন্দনের শব্দও শুনতে পাচ্ছি। বাড়ির দিকে চকিত চাউনি বুলালাম। আলো জ্বলছে দেখে স্বস্তি পেলাম। এবার কেঁপে উঠে আলোর কাছ থেকে দূরে হেঁটে গেলাম।

পিছনের ফেন্সের কাছে জমাট বেঁধেছে অন্ধকার। স্ট্রীটলাইট কিংবা বারান্দার আলো এখান অবধি পৌঁছয়নি। কাঠের গাদার চারপাশে ঘাসহীন। ফেন্সের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের স্তূপটাকে ভীতিকর দেখাল আমার চোখে। গাদা করা গুঁড়িগুলোকে দেখে কাঠ

নয়, সাপ বলে ভুল হতে পারে।

ছোট ডালগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আবছা আলোয় দেখে মনে হচ্ছে কিলবিল করছে, গা মোচড়াচ্ছে।

চোখ পিটপিট করে, আবছায়া আর গুঁড়িগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম।

এসময় নড়ে উঠল কী যেন।

একটা গুঁড়ি দুলে উঠেছে। শাণিত নখের খটাখট শব্দ কানে এল। কিছু একটা কর্কশস্বরে ককিয়ে উঠল। তারপর সব চুপচাপ।

গুঁড়িতে পায়ের ডগা দিয়ে ঠেলা দিলাম। ইঁদুর-টিঁদুর ঢুকল নাকি? মনে মনে আশা করছি মাকড়সার দল এখানে জাল বোনার সময় পায়নি। কাঠ তুলতে গিয়ে হাতে ঝুল লেগে গেলেই মেজাজ বিগড়ে যায় আমার।

একটা কাঠ তুলে নিতে ঝুঁকলাম। সাঁই করে বাঁ বাহুতে তুলে নিলাম ওটা। রুক্ষ বাকলে ছড়ে গেল চামড়া। দ্বিতীয়টা তুলতে যেতেই নড়ে উঠল হাতের কাঠটা। মনের ভুল আরকী।

পরমুহূর্তে, কীসে যেন কামড়ে দিল আমাকে।

দুই

চেঁচিয়ে উঠলাম। হাত থেকে কাঠটা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পিছু হটলাম। বাহু যেন পুড়ে যাচ্ছে। চামড়া জ্বালা করছে। যেখানটায় কামড় খেয়েছি চেপে ধরলাম। বাহুতে আর আঙুলে লেপ্টে গেছে চটচটে কী যেন। হাতটা টেনে সরিয়ে আনলাম। আঙুলগুলো জুড়ে গেছে। নাকে আসছে পচা গন্ধ।

মাটিতে পড়ে থাকা গুঁড়িটার দিকে চাইলাম। কী লেগে ছিল ওতে?

লাথি মারলাম ওটায়। নড়ে উঠল। আঁধারে চোখ সয়ে এসেছে।

কোনও কিছু গুঁড়িটার কাছ থেকে সরে যায় কিনা লক্ষ করলাম। কিছুই নড়াচড়া করল না। খসে পড়েছে কামড়ে দেওয়া প্রাণীটা। পায়ের পাতা দিয়ে উল্টে দিলাম গুঁড়িটাকে। এবার পিছনে সরে এলাম। কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আঁধারে দেখলাম, গুঁড়ির বাকলটা দেখতে বাকলের মত নয়। মুখের চেহারার মত। পুরানো, মৃত এক মুখ। চোখজোড়া বোজা। সরু-সরু দাগগুলো নাক, ভ্রূ, দাড়ি এসব ইঙ্গিত করছে। মানুষের মুখের মত নয়। বিকৃত। মুখগহ্বরের কাছে একটা গর্ত, তরল জাতীয় কিছু একটা গলগল করে মাটিতে পড়ছে।

আমার ধারণা হলো আঁধারে চোখে ভুল দেখছি আমি। গুঁড়িটাকে আবারও জুতোর ডগা দিয়ে উল্টে দিলাম।

উল্টে গেল ওটা। দীর্ঘশ্বাসের মত এক শব্দ কানে এল। মুখ তুলে চাইলাম। বাতাসের শব্দ। চোখ নামিয়ে মুখটাকে আবারও দেখার চেষ্টা করলাম। মুখের বদলে বাকল আর করাত দিয়ে যেখানটায় ছোট-ছোট ডাল-পালা কাটা হয়েছে সে দাগগুলো চোখে পড়ল।

কষে লাথি মারলাম গুঁড়িটাকে। মাটিতে দাপালাম পা। এটা স্রেফ একটা কাঠের গুঁড়ি। মোটেই নড়েনি। নিশ্চয়ই কোনও পোকা-টোকা আমাকে কামড়েছে। কিন্তু চামড়ায় বসে যাওয়া তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো এখনও অনুভব করছি আমি।

বাহু ঘষে খানিকটা আঠা খসালাম। দুর্গন্ধ। জিনিসটা মেখে রয়েছে আমার বাহু আর আঙুলে–যেতে চাইছে না।

জিন্সে হাত মুছে আরেকটা গুঁড়ি নিতে হাত বাড়ালাম। আমার আঙুল স্পর্শ করার আগেই পড়ে গেল ওটা। অন্যগুলোর উপর ধাক্কা খেয়ে আমার দিকে গড়িয়ে এল। সভয়ে পিছু হটলাম। অল্পের জন্য আমার পায়ে পড়েনি। পায়ের ডগা দিয়ে নাড়লাম গুঁড়িটাকে। সামান্য নড়ে উঠে নিথর পড়ে রইল।

আরও গোটা দুই গুঁড়ি টেনে বের করলাম। তিনটে হয়ে গেলে হনহনিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। বারবার পিছু ফিরে কাঠের স্তূপটার দিকে চাইছি। পরশুদিন হ্যালোউইন। তাই কেমন জানি গা ছমছম

করছে।

পিছনের দরজায় পৌঁছে সবচাইতে খারাপ ভুলটা করলাম। বারান্দার আলোয় পা রেখে হাতের গুঁড়িগুলোর দিকে চোখ নামিয়ে চাইলাম।

এক জোড়া মৃত, শূন্য চোখ পাল্টা চাইল আমার উদ্দেশে।

টলে উঠলাম। হাত থেকে খসে পড়ে গেল কাঠ। কী দেখলাম! এটা তো স্রেফ একটা মরা গাছ। মরা কাঠ। আর কিছু নয়। চোখ বুজে ফেলেছি।

চোখ যখন মেললাম, চোখ নয় কাঠের গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখলাম ঘাসের উপর। যে গাঁটগুলো থেকে ডাল কাটা হয়েছে সে জায়গাগুলো দেখতে খানিকটা শূন্য কোটরের মত লাগছে। অতটা ভয় পাওয়া আমার উচিত হয়নি। আসলে বারান্দায় ম্লান আলো ভুতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ। ফলে, মরা কাঠ দেখেই ভড়কে গেছি আমি।

ঘেমে গেছে শরীর। হয়তো কোন জাতের মাকড়সা কামড়ে দিয়েছে আমাকে। হয়তো বিষের কারণে চোখে ভুল দেখছি। মোটকথা, শরীর খারাপ করছে আমার।

গুঁড়িগুলো ফেলে রেখেই, বাড়ির ভিতরে পা বাড়ালাম। গায়ের চামড়া ঠাণ্ডা, অথচ ভিতরে ভিতরে পুড়ে যাচ্ছে।

'চাচী!' চেঁচিয়ে উঠলাম। দড়াম করে লাগিয়েছি পিছনের দরজা। হঠাৎই আলো দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। চাচা-চাচীকেও কাছে পেতে চাইছি।

বাহুর দিকে চাইলাম।

কিচ্ছু নেই, না কোনও ক্ষত, না আঁচড়ের দাগ। ব্যথার জায়গায় একটা আঙুল রাখলাম ধীরে ধীরে। স্বচ্ছ, হলদে এক ধরনের রস বেরিয়ে এল আঙুলের চাপে। প্রচণ্ড জ্বলুনি।

'চাচী!' চেঁচালাম আবারও। বাহুতে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে গেলাম তাকে খুঁজতে।

চাচার স্টাডিতে ঢুকতেই চাচা-চাচী মুখ তুলে আমার দিকে চাইল। সব কথা গড়গড় করে বলতে শুরু করলাম। চাচী আমার হাত

সরিয়ে বাহুর দিকে চাইল।

'কই, ফোলা-টোলা কিছুই তো নেই,' অবিশ্বাসের সুরে বলল।

'কিন্তু আমাকে কামড় দিয়েছে, ব্যথা করছে...'

'সব কাজ না করার ফন্দি...'

'না, চাচী, আমাকে কীসে যেন কামড়েছে!'

ভ্রূ কুঁচকে গেল চাচীর। সটান উঠে দাঁড়াল।

'স্প্রে লাগাবি চল। তারপর কাঠ নিয়ে আসবি। এবার আর কোনও অজুহাত শুনতে চাই না।'

চাচী আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

'কিশোর, ওখানে কিছুই নেই। তুই আমার গার্ডেনিং গ্লাভস পরে কাজটা সেরে ফেল,' বলল।

কাঁধ ঝুলে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। চাচীর গ্লাভস লণ্ড্রি রুম থেকে বের করে সঙ্গে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিলাম। বাইরে ঠাণ্ডা। অন্ধ ভূতের মতন নেচে বেড়াচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। কপাল থেকে ঘাম মুছে আগাছার জঙ্গলে পা রাখলাম।

কাঠ এখানেই ফেলে রেখে গেছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে আলো বুলিয়ে আগাছা যেখানে চেপ্টে গেছে সেখানটায় ধরলাম। ওখানে গুঁড়ি পড়ে থাকার কথা।

এ সময় কী যেন খসখস করে উঠল আমার পিছনে।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম।

শব্দটা থেমে গেছে। কেউ যেন আগাছার মধ্যে চলাফেরা করছিল। বিড়াল হতে পারে।

শেষমেশ যেখানে ফেলেছিলাম তার দশ ফুট দূরে খুঁজে পেলাম একটা গুঁড়ি। অতদূরে গেল কী করে?

গুঁড়িটার দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে পিছনের দরজা দিয়ে সেঁধিয়ে পড়লাম।

চাচী এবার আর আমাকে কাঠ আনিনি দেখেও কিছু বলল না।

'কিশোর, তোর মুখ শুকনো কেন? শরীর খারাপ নাকি?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল।

মাথা ঝাঁকালাম। চাচীকে বলতে চাইলাম গুঁড়িটার নড়াচড়া সম্পর্কে। কিন্তু আমি নিজেই তো বিশ্বাস করি না নিজে থেকে নড়েছে ওটা। চাচীকে কী বলব?

'চাচী, মাকড়সার কামড়ে কি মানুষ উল্টোপাল্টা দেখে?'

আমার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল চাচী।

'না। এখন শুয়ে থাকগে যা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়ানোর আগে এক ঝলক চাউনি বুলালাম পিছনের দরজার দিকে।

পরদিন সকালে বাহুটা সামান্য আড়ষ্ট ঠেকল।

'কিশোর,' চাচী ডাকল। 'নাস্তা খেতে আয়।'

বিছানা ছাড়লাম। সোয়েটশার্ট আর জিন্স পরে নিলাম। মুখে ছিটালাম পানি।

বাহুতে এখন আর ব্যথা নেই। তবে বড্ড চুলকাচ্ছে। শার্টের হাতা গোটালাম।

একী! হাত থেকে কনুই পর্যন্ত, আমার চামড়া রুক্ষ বাকলের মত দেখাচ্ছে। হলদে রস চুইয়ে বেরোচ্ছে কিনারাগুলো দিয়ে।

তিন

'চাচী!' ডাক ছাড়তে গিয়ে ককিয়ে উঠলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে চামড়া স্পর্শ করলাম। চামড়া বলে মনে হলো না। রুক্ষ। কাঠের মত।

বাথরুমে গিয়ে সিঙ্কের উপর ঝুঁকে পড়লাম। মুখের দিকে চাইলাম। অন্যরকম কিছু লাগল না। সামান্য একটু ফ্যাকাসে শুধু। বাহুর দিকে চোখ নামালাম।

জিনিসটা কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বাকল সেঁটে রয়েছে বাহুতে।

আমার ধারণা, সামান্য সাবান ঘষলেই উঠে যাবে। লম্বা করে শ্বাস টানলাম।

ব্রাশ নিয়ে, সিঙ্কে গরম পানি ভরলাম। এবার ঘষতে শুরু করলাম। খানিকটা উঠে এল। বাকলের নীচ থেকে চুইয়ে বেরোল দুর্গন্ধময় আরও হলদে আঠা। ঘষা থামিয়ে ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিলাম।

'কিশোর, স্কুলে যাবি না?'

বাহুর দিকে চাইলাম। জিনিসটা কী বুঝতে পারছি না। কিনারাগুলো চুলকোচ্ছে আর পুড়ছে। আঁচড়াতে সাহস হলো না। জিনিসটা যা-ই হোক, ছড়াচ্ছে।

পানি বন্ধ করে, একটা তোয়ালে জড়ালাম বাহুতে। এবার কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

'চাচী?' ডাকলাম।

আমার দিকে চাইল চাচী। নাস্তা তৈরি করছিল।

বাহু থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে দিলাম।

মুহূর্তের জন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চাচীর মুখের চেহারা। এবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাজে ব্যস্ত হলো, সিঙ্কে ডিশ রাখছে।

'এবার বুঝতে পারলাম কেন এত দেরি। কস্টিউম নিয়ে পড়ে ছিলি। মেকআপটা ভাল হয়েছে, কিন্তু এসব নিয়ে পড়ে থাকলে হবে?'

'এটা মেকআপ নয়। কাল রাতে আমাকে কীসে যেন কামড়েছে। এখন দেখতে পাচ্ছি হাতটা অন্যরকম হয়ে গেছে, চুলকাচ্ছে।'

চাচী ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল কপালে।

'জ্বর নেই। কাজেই স্কুল মিস করার কোন কারণও নেই। তুই কি কস্টিউমটা নিয়ে কাজ করতে চাস বলে বাড়িতে থাকতে চাইছিস?' জিজ্ঞেস করল।

'না, চাচী, সত্যি সত্যিই আমার শরীর খারাপ। ডাক্তার দেখানো দরকার!'

চাচী বাহু ভাঁজ করে ভ্রূ কুঁচকাল।

'এর আগেরবার খামোকা ডাক্তার হপকিন্সকে ভুগিয়েছিলি। মনে নেই, তোর চাচার লাল কলম দিয়ে হাম বানিয়েছিলি? ভদ্রলোক এখনও মনে করে রেখেছেন ঘটনাটা।'

'কিন্তু এবারেরটা মিথ্যে নয়! নিজেই দেখো!' চাচীর দিকে বাহু বাড়িয়ে দিয়ে এক টুকরো কাঠ তুলে নিলাম। পচা পাতার হলদে দুর্গন্ধময় রস বেরিয়ে এল।

চাচী নাক-মুখ চেপে ধরে অন্যদিকে চাইল।

'তোর মাথায় এরচেয়ে ভাল কস্টিউমের আইডিয়া এল না? তুই ঠিক তোর চাচার মত হয়েছিস। যাকগে, লাঞ্চ নিতে ভুলিস না। আর স্কুলের কোন মেয়েকে তোর স্টাণ্টবাজি দেখাতে যাস না যেন।'

চাচী আমার হাতে একটা বাদামি ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে, ঠেলে দিল পিছনের দরজার দিকে।

অনেক বলে-কয়েও বাহুর দিকে চাচীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না।

'এখন স্কুলের সময়। সন্ধেয় তোর কাজ দেখব। এখন আর কোন অজুহাত নয়,' সাফ জানিয়ে দিল চাচী।

আমার পিঠের উপর দরজা লেগে গেল দড়াম করে। চাচাকে বলে দেখা যেতে পারে। আচ্ছা, চামড়ার জিনিসটা যদি আরও ছড়ায়? যদি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তখন কী হবে? আমার সারা মুখ গাছের মত হয়ে যাবে না তো?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাস স্টপে চলে এলাম।

বাসে একাকী বসে রইলাম। বাহু ঢাকা পড়েছে সোয়েটশার্টের তলায়। গোটা বাহু চুলকাচ্ছে, আর পুড়ে যাচ্ছে। বাকল ঘিরে মনে হচ্ছে লাল পিঁপড়ে কামড়ে বেড়াচ্ছে। বাকলের নীচের অবস্থা আরও খারাপ। হাড় ব্যথা করছে। মাংসপেশী আড়ষ্ট। মুঠো শক্ত করতে কষ্ট হচ্ছে। আঙুলগুলো আঁকড়ে আসছে।

বাসে বসে রয়েছি, এক টুকরো বাঁকা কাঠের ছোট টুকরো বেরিয়ে এল নখের নীচ দিয়ে। বাঁ হাতের উপর ডান হাত চাপিয়ে

দিলাম।

মুখ তুলে চাইতেই দেখি, এক ছেলে আমার দিকে চেয়ে। চোখ সরিয়ে নিল ও। মুখের চেহারা ছাই বর্ণ।

শার্টের হাতায় হাত ঢেকে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম।

বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। এসব কী ঘটছে আমার সঙ্গে?

স্কুলে পৌঁছে, সোজা নার্সের অফিসে গিয়ে ঢুকলাম।

'কী, কিশোর, তোমার এবারের কস্টিউম কী? মমির অভিশাপ? নাকি পোড়া মুখ? নাকি আরও ভয়ংকর কিছু?'

এক পা থেকে অপর পায়ে ভর সরালাম।

'আমার শরীর খারাপ করছে।'

আমাকে বসতে দিলেন নার্স। আমার তাপমাত্রা নিলেন। জিভ বের করতে বললেন। হার্টবিট কান পেতে শুনলেন। এবার আমার দিকে চাইলেন।

'একদম সুস্থ।'

বড় করে ঢোক গিলে বাহু বাড়িয়ে দিলাম। তারপর শার্টের হাতা গোটালাম। বাহুতে ছড়িয়ে পড়েছে শক্ত, বাদামি বাকল। শিকড়ের মত কিলবিলে কী সব যেন বেরিয়ে এসেছে নখের তলা দিয়ে।

মিসেস গিলক্রিস্ট পিছু হটলেন। আমার বাহুর দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে থেকে দরজার কাছে হেঁটে গেলেন।

'ক্লাসে যাও। এসব স্টান্ট দেখিয়ে ছুটি পাবে না।'

'কিন্তু...'

'আর কোনও কথা নয়। তুমি কি চাও তোমার বাসায় ফোন করে কমপ্লেন করি?'

অগত্যা হাতা টেনে বেরিয়ে এলাম।

ক্লাসে সবার শেষে ঢুকলাম আমি। চুপচাপ ডেস্কে গিয়ে বসলাম।

রবিন ঝুঁকে পড়ল ওর ডেস্ক থেকে।

'বাসের কয়েকটা ছেলের কাছে তোমার কস্টিউমের কথা শুনলাম। কই, দেখি?'

মিসেস হকিন্স আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। চুপ করে গেল রবিন। 'পরে,' বলল। ক্লাস শুরু হলো।

মিসেস হকিন্সের কোন কথা আমার কানে ঢুকছে না। বাহুর চুলকানিটা বন্ধ হয়েছে। এবার কাঁধে শুরু হয়েছে। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পোকা হাঁটছে চামড়ার উপর দিয়ে। ডেস্কের নীচে বাঁ হাত রাখলাম। সোয়েটশার্টের হাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। দেখতে চাই না আমি।

লাঞ্চ বেল বাজলে মুসা আর রবিন উঠে এল আমার কাছে।

'কই, দেখি?' বলল রবিন। 'তুমি করেছ নাকি রাশেদ চাচা করে দিয়েছেন?'

উঠে দাঁড়িয়ে শার্টের হাতা গোটালাম।

'ঠাট্টা নয়, সত্যি।'

'তাই বুঝি? দেখাও না।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। লাঞ্চ বেঞ্চের উদ্দেশে এগোলাম।

বেঞ্চে বসে বন্ধুদের দিকে চেয়ে রইলাম। ব্যাগ থেকে আপেল বের করে কামড় দিল মুসা। ওরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে আমার কথা। করলে পাশে কাউকে পাব আমি।

চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শার্টের হাতা টেনে উঠালাম।

রবিনের চোখ ছানাবড়া। মুখ হাঁ।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। আপেল নামিয়ে রাখল। 'ধরে দেখি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

আঙুল দিয়ে আমার বাহুতে মৃদু খোঁচা দিল ও।

হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল। ওর স্পর্শ অনুভব করিনি আমি। ভারী ঠেকছে বাহু, ওটা যেন আর আমার নয়।

'এটাই তোমার সেরা কস্টিউম...'

'মুসা, এটা কিন্তু সত্যিসত্যিই হয়েছে!' চোখ কটমট করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

হাত সরিয়ে পিছনে সরে গেল ও।

'খেপছ কেন? তুমি এটা দেখিয়ে সবাইকে বোকা বানাতে চাও,

আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'বোকা কোথাকার, বললাম তো এটা স্টাণ্ট নয়–সত্যি। তুমি তো হাত দিয়েই দেখলে। কাঠের মত। আমার সারা শরীর গাছ হয়ে যাচ্ছে।' কাল রাতের ঘটনা ওদেরকে খুলে বললাম। কাঠ আনতে গিয়ে কীভাবে কামড় খাই। বাহুর দিকে তাকালাম। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

'আমি একটু ছুঁয়ে দেখি,' বলল রবিন। পরমুহূর্তে শিউরে উঠল।

'আমার মনে হয় গুঁড়িটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে,' বললাম।

'দুর্দান্ত হয়েছে এবারের কস্টিউমটা,' বলল রবিন।

'তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না?' মরিয়ার মত বলে উঠলাম।

রবিনকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিঁচ-কিঁচ করে উঠল বাহু, কনুই ভাঁজ করতে পারছি না।

মুসা আর রবিন অন্যান্য ছেলে-মেয়েদেরকে আমার কস্টিউমের কথা বলতে গেল। একটু পরে দেখতে পেলাম আমাকে দেখিয়ে ওরা কী সব বলাবলি করছে।

খিদে নেই, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। খানিক বাদে উঠে দাঁড়ালাম। খেলার মাঠের এক কিনারে গিয়ে বসে পড়লাম।

ওদিকে, টেবিলে বসে ছেলে-মেয়েরা আলোচনা করছে হ্যালোউইনে তারা কী পরবে। বানোয়াট সব পোশাক। ধুলোয় আঙুল চালালাম। মিথ্যে সব কিছু এমুহূর্তে অসহ্য লাগছে আমার । ঘৃণা হচ্ছে হ্যালোউইনকে। এ ঘটনা বছরের অন্য কোন সময় ঘটলে এখন আমি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতাম। কিন্তু এখন হ্যালোউইনের আগে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

এক মুঠো ধুলোমাটি ছেড়ে দিলাম আঙুলের ফাঁক দিয়ে। কালো মাটির দলা পড়ল মাঠে। এক দলা মাটি আটকে গেল আমার দু আঙুলের ফাঁকে। মুখে আঙুল পুরে মাটি চাটলাম।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক মুঠো মাটি চালান হয়ে গেছে আমার মুখের ভিতরে। ঝুঁকে পড়ে থু-থু করে ফেলে দিলাম। মুখ

মুছে নিলাম। তবে তাতে কোন লাভ হলো না। মাটির স্বাদ ভাল লেগেছে আমার।

যে দ্রুত গতিতে রূপান্তর ঘটছে আমার, হ্যালোউইনের পর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

চার

'স্কুল কেমন হলো?' কাগজ থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করল রাশেদ চাচা। কিচেনে ঢুকেছি আমি।

চাচাকে বাহু দেখাতে ইচ্ছে করছে না। যদি বিশ্বাস না করে? কিন্তু করতে হবে। স্টান্ট দেখিয়ে চাচাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। চাচা নিশ্চয়ই বুঝবে আমারটা আসল।

সোয়েটশার্টের হাতা তুলে বাহু বের করলাম।

'চাচা, দেখো।'

চাচা এক ঝলক চাইল বাহুর দিকে, তারপর মৃদু হেসে শিস দিয়ে উঠল। কাগজটা নামিয়ে রেখে আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।

'কী এটা?'

আমার বাহুটাকে এমুহূর্তে কাঠের গুঁড়ির মতন দেখাচ্ছে। বাকলটা আরও শক্ত হয়েছে। আঙুলের তলা দিয়ে বেরনো শিকড়গুলো আরও জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে। এখন আর টান দিয়ে বাকল তোলা সম্ভব হচ্ছে না, শুধু কিনারাগুলো ছাড়া। বাকল ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড় থেকে পিঠ অবধি। চিড়চিড় করে জ্বলছে। পিঠ চুলকোতে গেলে বাহুতে ব্যথা লাগছে।

আঙুলের গাঁট দিয়ে আমার বাঁ বাহুতে টোকা দিল চাচা। ভ্রূ কুঁচকে গেছে।

'ব্যাপারটা সিরিয়াস।'

মাথা ঝাঁকালাম। চোখভরে পানি আসছে। কাঁদতে চাই না। চাই চাচা একটা কিছু করুক।

'গুঁড়িটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে, চাচা। আমাকে বদলে দিচ্ছে।'

আমার দিকে ভ্রূ তুলে চাইল চাচা।

'আধা মানুষ আধা গাছ, এভাবেই রাখবি? নাকি পুরোটাই করবি?'

'চাচা! এটা সত্যিকারের কাঠ।' বাহু তুলে ধরলাম। আঙুলগুলো নড়তে গেলে শব্দ করে উঠল। একটা আঙুলও ঠিকমত নড়ল না।

'নিশ্চয়ই। আইডিয়াটা ভাল সত্যিকারের কাঠ লাগিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিস। সারাদিন ধরে আঠা দিয়ে এক টুকরো এক টুকরো করে লাগিয়েছিস, তাই না? কোন্ আঠা ব্যবহার করছিস তুই?' আমার ঘাড়ের কাছের বাকল খুঁটল চাচা। তারপর নাক কুঁচকে সরে গেল। 'এহ, পচা গন্ধ। তোর চাচী খুব খেপাবে।'

অতি কষ্টে নিজেকে সামলালাম। চাচাকে বিশ্বাস করাতে হবে আর কথা।

'এটা আঠা নয়, চাচা, রস। জিনিসটা আমাকে গাছ করে দিচ্ছে!'

আমার কাঁধে হাত রাখল চাচা। তার দিকে চাইলাম। মাথা ঝাকাল চাচা, মুখের চেহারা গম্ভীর।

'আমি কাউকে বলব না এটা বানোয়াট। আমি তোর কাজ দেখে গর্ব বোধ করছি।'

'চাচা, আমার ডাক্তার দেখানো দরকার!' উদ্‌গত অশ্রু চেপে বললাম।

'তা হলে তো গাছের ডাক্তার ডাকতে হয়।' বলে আমার উদ্দেশে চোখ টিপে আবার কাগজ নিয়ে বসল চাচা।

পা টেনে টেনে নিজের ঘরে চলে এলাম। দরজা লাগিয়ে দিলাম জোরে। বিছানায় গা ছেড়ে দিয়ে পড়ে রইলাম। বালিশে মুখ গুঁজে রেখেছি। চাচা সত্যি আমার কথা বিশ্বাস করেনি। কেউই করেনি। সবার ধারণা, হ্যালোউইনের জন্য দুর্দান্ত এক কস্টিউম নিয়েছি

আমি। অথচ অপুর্ব(!) এই কস্টিউম ধীরে ধীরে গ্রাস করে নি
আমার দেহ।

কী করব এখন? পিঠ চুলকোচ্ছে, গায়ের থেকে যেন খসে প
চামড়া।

শুয়ে থেকে বাহুর দিকে চাইলাম। নিজের বাহু বলে মনে হ
না। কেটে ফেলতে ইচ্ছা করছে এটাকে। এটা আমার শরীরের
নয়। আমার মাংসপেশী আটকা পড়েছে গাছের বাকলের নী
নড়াচড়া করতে পারছে না।

ফাঁদে পড়ে গেছি আমি!

জিনিসটা বুকের কাছে চলে এলে কী হবে? আমার শ্বাস-প্র
কি থেমে যাবে? হৃৎপিণ্ডের কী অবস্থা হবে? মুখের ভিতরে পে
গেলে কি আর কথা বলতে পারব? খিদে পেয়েছে আমার।
খিদে অন্য খিদে।

মাটি খেতে সাধ হচ্ছে! জিভে জল আসছে মাটি খাওয়ার
ভাবলে। কিন্তু সেটা সম্ভব না! বালিশ এতটাই জোরে চেপে ধর
ফ্যাকাসে হয়ে গেল আঙুলের গাঁট।

উহ্, এখানে এত গরম কেন? মনে হচ্ছে গরমকাল এ
ফুরোয়নি।

উঠে গিয়ে বাথরুমের কল ছাড়লাম। ঝুঁকে পড়ে মুখ
দিলাম পানিতে। পানি গিলছি। পেট ফুলে ওঠা না পর্যন্ত এ
পান করলাম। মাটি খাওয়ার চাইতে এ-ও বরং ভাল।

এবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চাইলাম।

ঘাড় থেকে মুখের দিকে চলে এসেছে বাকল।

ঘাড়ের কাছ থেকে সোয়েটশার্ট সরিয়ে দিলাম। এখানটা
গরম লাগছে কেন? আহা, নকল ক্ষতের মত যদি এটাকে টে
ফেলতে পারতাম! কিংবা যদি কেটে ফেলা যেত। কিন্তু কাজটা
সাহস হলো না। যদি দেখা যায় বাকলের নীচে শুধু হলদে দ
আঠা? কেটে ফেললে আবারও যদি গজায়? কিংবা গজাল না,
হলদে তরল চুইয়ে চুইয়ে বেরোতেই থাকল, তখন?

এবার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এল।

এটার হাত থেকে বাঁচার হয়তো আরেকটা উপায় আছে। পিছনের উঠনে এখনও পড়ে রয়েছে গুঁড়িগুলো।

সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এসে গ্যারেজে ঢুকলাম। আমার হাতে চাচার কুঠার। এবার পা বাড়ালাম কাঠের গাদার উদ্দেশে। গুঁড়িগুলো আমার দুরবস্থার জন্য দায়ী। ওরা মৃত নয়। কিন্তু আমি যদি ওদেরকে মেরে ফেলতে পারি তা হলে হয়তো ওরা থামবে।

সূর্য ডুবে গেলেও আলো রয়েছে যথেষ্ট । ভারী, ভেজা কুয়াশা নেমে আসছে আকাশ থেকে। চারধারে চোখ বুলিয়ে, আগাছা ভেদ করে এগোলাম। ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে কেউ আমার অলক্ষে লক্ষ করছে আমাকে। আমি জানি কী সেটা।

কাঠের স্তূপের কাছে পৌঁছলাম। গুঁড়িগুলোকে মানুষের মুখের চেহারার মতন লাগছে। একটা গুঁড়িতে লাথি মারতেই গড়িয়ে গেল। আমি ওদের মুখ দেখতে চাই না।

'এসব বন্ধ করো!' চেঁচিয়ে উঠলাম। ভীত। ঠোঁট ভিজিয়ে নিলাম। দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছি কুঠারটা। এবার এক কাঁধের উপর তুলে সজোরে নামিয়ে আনলাম। কোন্ গুঁড়িটায় আঘাত হানলাম জানতে চাই না আমি। শুধু চাই ওদের মৃত্যু। মুক্তি চাই ওদের হাত থেকে–চিরদিনের জন্য।

কুঠারটা গেঁথে গেল কাঠে, দেবে গেল বাকলের ভিতরে।

পরমুহূর্তে, অসহ্য যন্ত্রণা করে উঠল আমার বাঁ বাহুটায়।

পাঁচ

বাহু চেপে ধরলাম। কুঠার ফেলে দিয়ে পড়ে গেলাম হাঁটুর উপরে। তীব্র ব্যথা। মিনিটখানেক মাটিতে পড়ে রইলাম নিথর। তারপর কোনমতে উঠে দাঁড়াতে পারলাম। পিছনের দরজার কাছে গিয়ে

বাড়ির গায়ে হেলান দিলাম।

হলদে রস বেরিয়ে আসছে বাহুর এক দাগ থেকে। সদ্য জন্মানো দাগটা দেখে মনে হচ্ছে কুঠারের কাটা বুঝি। হাত চাপা দিয়ে ব্যথা কমাতে চেষ্টা করলাম। বাহু থেকে পিঠ অবধি ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র যন্ত্রণা।

মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি, হেলান দিলাম পিছনে। চাচী যদি আজকে আগুন জ্বালতে চাইত তা হলে কী হত? গুঁড়ি পোড়াতে যদি চাইত? অসুস্থ বোধ করলাম। কাঠ পোড়ালে হয়তো আমার গায়েও আগুন ধরে যেত।

আজ রাতে আগুন জ্বালতে দেওয়া যাবে না। আমার সঙ্গে যা ঘটল তার পর তো প্রশ্নই ওঠে না।

ভিতরে গেলাম আমি।

চাচা-চাচী লিভিংরুমে। তাদের নিচু গলার কথা-বার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কাছিয়ে গেলাম যাতে শুনতে পারি।

'কিশোর বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না তো?' চাচীর কণ্ঠ ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন শোনাল।

উঁকি মেরে দেখি সোফায় বসে চাচী। তার পাশে চাচা।

'মজা করছে করতে দাও। আমিও প্রথম প্রথম করেছি। শীঘ্রি থেমে যাবে,' চাচা জবাবে বলল।

চাচার বাহুতে হাত রাখল চাচী।

'তোমাদের দু'জনের মধ্যে কার স্টাণ্ট যে বেশি ভয়ঙ্কর বুঝি না, বাবা!'

মৃদু হাসল চাচা।

'কে জানে, এই গুণ কাজে লাগিয়ে ও একদিন হয়তো অনেক বড় হবে।'

চাচীর মুখেও স্মিত হাসি ফুটল।

'হ্যালোউইন পর্যন্ত কিছু বলব না আমি। তারপর কিন্তু এসব বন্ধ করতে হবে। এই প্রথম ওর কস্টিউম দেখে ভয় পেয়েছি আমি। আমি এসব আর দেখতে চাই না।'

চাচী আর চাচার গলা খাদে নেমে গেল। সরে এলাম আমি। অন্ধকার হল-এ এসে বাহুর দিকে চাইলাম। আমিও এসব আর দেখতে চাই না। কিন্তু কীভাবে মুক্তি পাব এটার হাত থেকে? হাসপাতালেও কি এর চিকিৎসা আছে? মনে তো হয় না।

বাকল এখন আমার বুকে ছড়িয়েছে। চামড়া বেয়ে গুড়ি মেরে পায়ের দিকে চলেছে। আর ক'দিন সময় আছে আমার হাতে? একদিন? হয়তো। কিন্তু হ্যালোউইনের পরে কতখানি বাকি থাকবে আমার? আসল আমার কথা ভাবছি।

কিছু একটা করতে হবে, এবং দ্রুত। কাঠগুলো কোত্থেকে এসেছে জানতে পারলে হয়তো কোন সমাধান পেতে পারি। জঙ্গল সম্পর্কে জানে এমন কেউ হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

হল ধরে এগিয়ে চাচার স্টাডিতে ঢুকলাম।

স্টিলের বাক্সে মেকাপের সরঞ্জাম রাখে চাচা। সার বেঁধে ওগুলো রাখা হয়েছে তার ডেস্কের পাশে। একগাদা কাগজ ছেয়ে রেখেছে ডেস্ক, ফোন আর অন্যান্য সব কিছু।

ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে কাগজগুলোয় চোখ বুলালাম। বেশির ভাগই বিলের মতন দেখাল। কয়েকটা হলদে পোস্ট-ইট নোটে হিজিবিজি করে লেখা: মো লন। শেষমেশ খুঁজে পেলাম।

গোলাপি এক স্লিপে লেবেল সাঁটা: শেরিংহ্যাম নার্সারি, কাঠের অর্ডার দেয়া হয়েছিল এখানে। বিলটা ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। কাল স্কুলের পর ওখানে গিয়ে খোঁজ-খবর নেব।

ডিনারে, চাচা-চাচী এমন সহজ আচরণ করল, আমার বাহু নিয়ে যেন কোন সমস্যা নেই। ডিনারের পর সিঙ্কে প্লেট নিয়ে গেলাম। চাচী আমার চুল এলোমেলো করে দিল।

'আজ রাতে আগুন জ্বাললে কেমন হয়? কয়েকটা মার্শম্যালো, কিছু চকোলেট আর গ্রাহাম ক্র্যাকার রয়ে গেছে,' বলল।

'চাচী, ভয়ানক গরম লাগছে।'

আমার দিকে চাইল চাচী।

'কোথায় গরম?'

'তুমি আগুন জ্বাললে আমি পুড়ে যাব।' ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলতে চেষ্টা করলেও গলা ধরে এল। কথাটা তো আক্ষরিক অর্থেই সত্যি।

চাচী চাচার দিকে এক ঝলক চাইল।

'ঠিক আছে...'

'আজ রাতে না,' বলে উঠলাম আমি। হাসার চেষ্টা করলাম। 'আগুন জ্বাললে আমার আঠা গলে যাবে।'

এবার হাসি ফুটল চাচীর মুখে।

'বুঝেছি। ঠিক আছে, আমরা না হয় আরও দু'একদিন আগুন জ্বালব না।'

খানিক পরে নিজের ঘরে চলে এলাম।

বাহুতে আর কোন অনুভূতি নেই। ঘাড় আর মুখে চুলকানি, জ্বালা-পোড়া। কালকে আমাকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে ভাবতে চাই না। শুধু কামনা করছি নার্সারিতে পৌঁছবার আগে পর্যাপ্ত সময় পাব।

ঘুম ভাঙতে, মুখে হাত বুলিয়ে ছুটে গেলাম।

বাঁ চোখ ঢাকা পড়েছে বাকলের নীচে। পাজামা টপ খুললাম। বুকেও ছড়িয়েছে জিনিসটা। বাঁ পা-টা কেঠো, আড়ষ্ট ঠেকছে। বাঁ হাতের দিকে চাইলাম।

আঙুলগুলো লম্বা হয়ে গেছে। ডাল-পালার মত বাঁকা। এমনকী বাঁকাতেও পারছি না। ডান বাহুতে এমন জ্বলুনি শুরু হয়েছে। হাতে সময় বেশি নেই।

কাপড় পরতে অনেক সময় লেগে গেল। ঢোলা জিন্স পরতে হলো। শার্টের হাতায় বাঁ হাত ঢোকাতেই ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হলো। তুলে ধরে রাখতে ভাল লাগল।

এবার দেখতে পেলাম উঁচিয়ে রাখলে গাছের ডালের মত দেখায়। ডান হাতে বাঁ হাতের কব্জি চেপে ধরে বাহুটাকে নীচে নামিয়ে আনলাম। নামতে চাইছিল না, টেনে নামাতে হয়েছে। সামনে কঠিন সময়।

পা টেনে টেনে কিচেনের পাশে এলাম।

চাচী আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে

হয়ে গেল। রেযর ব্লেডের স্টাণ্টের সময় তার কাছ থেকে এই বিস্ময় আশা করেছিলাম আমি। এখন নয়, কেননা এবারেরটা তো সত্যি।

কিছু বললাম না। বলার চেষ্টাও করলাম না। মুখের ভিতরটায় চুলকানি আর জ্বালা-পোড়া শুরু হয়েছে। মুখের ভিতরে পিঁপড়ে যেন পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'এবারের ফার্স্ট প্রাইযটা তুই-ই পাবি,' বলল চাচা। কিচেনে এসে ঢুকেছে। 'যদি বলিস তো তোকে আজকে নিয়ে আসতে পারি।'

মাথা নাড়লাম। একটা পরিকল্পনা এসেছে মাথায়।

'রবিনের বাসায় যাব স্কুলের পরে,' বললাম। কণ্ঠস্বরটা নিচু আর ভারী শোনাল। গলায় একটা হাত রাখলাম। মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে। মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে বাকল।

চাচী আমার দিকে চাইল।

'কিশোর, এই পোশাকে খেতে পারবি তো?'

'খিদে নেই।' কেমন জানি জড়িয়ে গেল কথাগুলো।

কমলার রসে স্ট্র রাখল চাচী।

'তা হলে অন্তত এটা খেয়ে যা।'

তেষ্টা পেয়েছিল। পান করলাম। বিস্বাদ লাগল। বাইরে তাকাব না পণ করেছি। মাটির টান অনুভব করছি দস্তুর মত–গতকাল কী ভালই না লেগেছিল মাটির স্বাদ।

গাড়ি করে স্কুলে যাওয়ার পথে চাচা কয়েকবার জিজ্ঞেস করল কীভাবে পোশাকটা বানিয়েছি। জড়ানো, অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দেওয়ার পর চাচা বলল, এ নিয়ে পরে কথা বলবে।

সে সময় পেলে হয়, বললাম মনে মনে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করেছে।

বাইরে কুয়াশা, আঁধার–স্যাঁতসেঁতে ভাব। চাচার পরনে মোটা সোয়েটার। অথচ সাধারণ শার্ট আর জিন্সেই ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি আমি।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

'এই পোশাকে ঠিকমত নড়াচড়া করতে পারবি তো?' চাচার প্রশ্ন।

ঝুঁকে পড়ে জানালার কাঁচ ভেদ করে চাইলাম। হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখের বাঁ পাশটা নড়ল না। অস্পষ্ট জবাব দিয়ে চাচার দিকে চেয়ে রইলাম। অদ্ভুত এক ভুতুড়ে অনুভূতি–এবারই হয়তো শেষ দেখা–তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে বাধ্য করল। এবার মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা।

স্কুলে গোটা দুই ভ্যাম্পায়ার আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। দুটো গোলাপি ভূত চেয়ে রইল আমার দিকে, আমি এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠন পেরোচ্ছি। বাঁ পা চুলকাতে শুরু করেছে। দাপাতে ইচ্ছে করছে, এতটাই চুলকাচ্ছে আর জ্বালা-পোড়া করছে। কিন্তু হাটু ভাঁজ করতে পারলাম না।

'অ্যাই, কিশোর!'

ঘুরে দাঁড়াতে রবিনকে দেখতে পেলাম। বুকের উপর রুপোলী এক ট্র্যাশ ক্যান পরেছে ও। মুখের রং রুপোলী। হাতে কুঠার। ধারাল ফলা দেখে সরে দাঁড়ালাম একপাশে।

'আমি টিনের কাঠুরে!' কুঠার দুলিয়ে বলে উঠল ও। লক্ষ করলাম কুঠারটা রবারের। স্বস্তির শ্বাস ছাড়লাম। দাঁত বের করে হাসল রবিন। 'আজকে রাতে সবাইকে ভড়কে দেব!'

আরও কয়েকটা ছেলে-মেয়ে ঘিরে ধরল আমাকে। ওদের একজন হাত বাড়িয়ে আমার বাহু স্পর্শ করল।

'আমি কাউকে ভয় দেখাতে চাই না,' আওড়ালাম। অবাক চোখে সবাই চেয়ে রইল আমার দিকে। রবিন হাসল আবারও।

'তুমি তো এর মধ্যেই সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ,' বলল।

মেজাজটা সহসাই বিগড়ে গেল। এরা মনে করছে আমি হ্যালোউইনের পোশাক পরেছি। এদেরকে এমন ভয় দেখাব যাতে চিরদিন মনে থাকে। ওদেরকে ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব। ওদের বুঝিয়ে দেব এমন ঘটনা ওদের জীবনেও ঘটতে পারে।

মুখের কাছে হাত এনে নাকের বাকল টেনে তুললাম। দুটো মেয়ে আর্তনাদ ছাড়ল। আরও দুজন ছেলে পিছু হটল। মুখে হাত ঘষে মাখিয়ে নিলাম হলদে রস। এবার হাতটা বাড়িয়ে দিলাম ওদের

উদ্দেশে।

'তোমাদেরকে আমার মত করে দেব!' চেঁচিয়ে উঠলাম।

মেয়ে দুটো ঘুরেই দিল দৌড়। বেল বাজলে সবাই ক্লাসের উদ্দেশে ছুটল। আমি বাহুটা নামিয়ে ফেললাম।

'দুর্দান্ত!' বলে রবিন ঠং-ঠং শব্দ তুলে হেঁটে এল আমার কাছে। 'তোমারটাই সেরা। সবাই যা ভয় পাবে না!' আমার দিকে চেয়ে চওড়া হাসল। 'একবার শুধু চামড়া তুললেই হলো।'

ডান কাঁধ ঝুলে পড়ল আমার।

'এসব দেখাব কখন? আমার আরও কাজ আছে।'

ভ্রূ কুঁচকে চাইল নথি।

'বলো কী? নতুনদেরকে ভয় দেখাতে হবে না?'

'আচ্ছা, মুসা কোথায়?' শ্রাগ করে জিজ্ঞেস করলাম।

'দেখছি না তো। হয়তো আছে কোথাও,' জানাল রবিন।

ক্লাসের দিকে পা বাড়ালাম আমরা।

স্কুল আগে আগে ছুটি দিলেও আমার মনে হচ্ছিল সময় যেন আজ আর ফুরোচ্ছেই না। সেরা কস্টিউম আমারটাই হলো। মিসেস হকিন্স আমার ডান হাতে রিবন বেঁধে দেওয়ার সময় অদ্ভুত চোখে চাইলেন। স্কুল থেকে বেরিয়েই রিবনটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

রবিনের মাকে অনুরোধ করলাম আমাকে নার্সারিতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ওঁকে বললাম চাচার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে আমার। রবিন আমার উপর অভিমান করে রয়েছে। কথা বলল না। গাড়ি থেকে নেমে ওদেরকে চলে যেতে দেখলাম।

কাউন্টারের পিছনে বসা মহিলা আমার দিকে চেয়ে হাসল। প্রশংসা করল আমার কস্টিউমের। অতিকষ্টে জিজ্ঞেস করতে পারলাম কে বেচেছিল কাঠগুলো। মহিলা এমনভাবে হাসল যেন কৌতুক করেছি আমি।

'রীড তোমাকে হেল্প করতে পারবে। ও পিছনে আছে।'

পিছনে চলে এলাম। মাটিতে গাঁথা গাছগুলোকে দেখে জিভে জল এল আমার।

সোনালীচুলো এক যুবক কাঠ গাদা করছিল। কাঠগুলোর দিকে চাউনি বুলালাম। কোন চোখ-মুখ নেই, কাজেই কাছিয়ে গেলাম।

'রীড?' ডাকলাম। শব্দটা আড়ষ্ট শোনাল।

কাজ থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকাল লোকটা। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে, আপাদমস্তক জরিপ করে নিল। এবার এক পা এগিয়ে এল।

'চমৎকার কস্টিউম পরেছ।'

শ্রাগ করলাম।

'ধন্যবাদ।'

একটা দস্তানা খুলে আমার মুখে হাত বুলাল ও। কোন অনুভূতি হলো না আমার।

'দারুণ। আসল বাকল। গাছ থেকে খুলতে নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে। গাছটাকে মেরে ফেলনি তো?'

'না,' জানালাম।

স্কুলে লেখা নোটটা বের করে ওর হাতে দিলাম। চাচার স্টাডি থেকে জোগাড় করা বিলটাও দিলাম।

নোট আর বিলটা এক পলক দেখে নিয়ে আমার দিকে চাইল ও।

'এমন অদ্ভুত কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। এই কাঠগুলোর জন্যে এত চিন্তা করছ কেন?'

নোটটার দিকে আঙুল তাক করলাম।

আরও খানিকদূর পড়ে মাথা নাড়ল ও।

'ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট? রিপোর্ট করবে?' মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমরা আমাদের সময় বুক রিপোর্ট করতাম। তুমি জানতে চাইছ তোমাদের কেনা কাঠ কোথা থেকে এসেছে?' এবং এর মধ্যে স্পেশাল কোন ব্যাপার আছে কিনা।' বিলটা দেখে নিয়ে মাথায় হাত বুলাল ও। 'গত সপ্তাহে কাটা হয়েছে। নিশ্চয়ই বুড়ো অ্যাশ হবে।'

আমার বাহুর দিকে চাইল আবারও।

'বুঝেছি। অ্যাশের বাকল কোত্থেকে পেয়েছ বুঝতে পারছি। ওই গুঁড়িগুলো থেকে। গাছও ছিল বটে একখান। আশি ফুট লম্বা।

ওরেগন অ্যাশ। ল্যাটিফোলিয়া বলা হয়। শীতে পাতা ঝরে। গাছটা কাটার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কী করব–আধমরা হয়ে ছিল, পরের ঝড়টা এলেই পড়ে যেত।'

কথা বলেই চলল ও, বেশির ভাগই আমার জন্য অপ্রয়োজনীয়। শেষমেশ জিজ্ঞেস করতে পারলাম, 'কোথায়?'

কথাটা জড়িয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে রইল ও।

'ও, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছ ওটা কোথায়? তুমি হয়তো চেনো জায়গাটাকে।' মাথায় হাত বুলাল আবারও। 'পার্ক স্ট্রীটের পুরানো কবরগুলোয় যে অ্যাশ গাছগুলো আছে ওটা তারই একটা।'

ছয়

গোরস্থানে যখন পৌঁছলাম, সূর্যটা তখন অগ্নিগোলার মত ফেটে পড়তে চাইছে। আকাশের বাদবাকি অংশ ঢাকা পড়েছে ছায়ার আড়ালে। লনেও বিস্তৃত হয়েছে ছায়া–শুকনো বাদামী পাতার অনেকখানি অবধি গ্রাস করেছে।

রীড আমাকে আর কিছু বলেনি। গাছ-পালা নিয়ে অনেক কথা বলেছে। আমার প্রশ্নগুলোয় চোখ বুলিয়েছে। কারও চামড়া বাকলের মত হয়ে গিয়েছে কিনা–প্রশ্নটা পড়ে হেসেছে।

পার্ক স্ট্রীট শহরের পুরানো এলাকায় পড়েছে। কবরস্থানের অন্ধ গলি ওটা।

শহরের অন্যপ্রান্তে নতুন এক কবরস্থান বানানো হয়েছে। সেটা পার্ক স্ট্রীটের মত ভুতুড়ে না। পার্ক স্ট্রীটটা গা ছমছমে বলেই আমরা সব সময় এখানে আমাদের হ্যালোউইন শেষ করি।

ভূতের গল্প বলি আমরা। ক্লাসের নতুন ছেলে কিংবা মেয়েটিকে কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে দৌড়তে বলি।

রবিন আর মুসা আজকে এখানে আসবে কিনা কে জানে।

এক কিনারে এক সার গাছ। লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা বাদবাকি অংশ।

কবরগুলোর দিকে চাইলাম। মার্কারগুলোকে পাত্তা দিলাম না। কিন্তু অস্তরাগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা, প্রাচীন গাছগুলোকে পছন্দ হলো না আমার।

মরচে ধরা লোহার গেট দিয়ে ঢুকে, গাছ-গাছালির উদ্দেশে পা চালালাম। দানবের মত দাঁড়িয়ে ওরা। আশি ফুট লম্বা, নার্সারির লোকটা বলেছিল। আশপাশের বাড়ি-ঘরের চাইতেও লম্বা। কবে থেকে ওগুলো এখানে আছে কে জানে।

পা ব্যথা করছে। জুতো খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে, তবে অতটা ঝুঁকতে পারব কিনা জানি না। এসময় শব্দটা কানে এল।

চোখ নামিয়ে চাইলাম। শেষ বিকেলের আলোয় পায়ের কাছে কিলবিলিয়ে উঠল গাছের শিকড়। এবার ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ল মাটির গভীরে। ঝটকা মেরে পা সরালাম। লাফিয়ে সরে আসতেই এক গোছা ঘাস উঠে এল।

বসে পড়ে, পা তুলে মাটি থেকে শিকড়টা টেনে বের করতে চেষ্টা করলাম। প্রান্তগুলো তখন কিলবিল করছে। থাবড়া মারলাম। মনে প্রাণে চাইছি এ অবস্থা থেকে যাতে মুক্তি পাই। শেষমেশ আমার স্নিকার্স পেঁচিয়ে ধরল শিকড়গুলো। চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাল চোখটা বন্ধ করলাম। আমি আগের মত হতে চাই। মনে হলো বুকের উপর চেপে বসেছে জিনিসটা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কী হবে?

উঠে দাঁড়িয়ে লন ধরে আবারও পা বাড়ালাম। যদ্দূর সম্ভব মেটো পথ ধরে চলেছি। দ্রুত হাঁটছি। পায়ের দিকে চাইছি না, কিন্তু গজিয়ে ওঠা কিলবিলানো শিকড়গুলোকে অনুভব করতে পারছি।

ডান পা আর বাহুতে ছড়িয়ে পড়েছে চুলকানি। বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে। পেটও। শরীরের বাঁ পাশটা পুরোপুরি অবশ।

আমার সামনে সারিবদ্ধ সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে এক সার গাছ।

মাঝখানে ফাঁকা একটু জায়গা। ওখানে সমতল এক গুঁড়ির

অংশবিশেষ।

কাছিয়ে গেলাম। মাটিতে ছায়া ফেলেছে গাছগুলো। বিষণ্ন পরিবেশ। কুয়াশা উঠছে মাটি থেকে।

পশ্চিমা বাতাস বইছে। থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইলাম। সূর্য ডুবে গেছে। আকাশে চাঁদ নেই। একটা তারাও চোখে পড়ল না। কী করছি এখানে নিজেও জানি না। মনে পড়ছে না। কী করতে এসেছিলাম?

ভুলে গেছি। কী যেন খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, তাই না?

গাছগুলো মৃদু মর্মরধ্বনি করছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে চাইলাম, কিন্তু শিকড় গেঁথে গেছে মাটিতে। পা তুলতে পারছি না। কান্নার মত ককিয়ে উঠে বাঁ পা চেপে ধরে টান দিলাম।

গাছের রুক্ষ বাকল যেন মোলায়েম হয়ে বদলে গেছে। মুখ উদয় হয়েছে। মানুষের মুখ নয়। প্রাচীন মুখ। ঘৃণায় বিকৃত। পটাপট খুলছে চোখ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো আমার। শূন্য কোটর। শুধু নিখাদ অন্ধকার।

মাথার উপরে চাবুক কষল ডাল-পালা। তবে বাতাস থেমে গেছে।

আমার চারপাশে ঘিরে দ্রুত উঠে আসছে কুয়াশা। ভারী, ঘন আর নিঃশব্দ।

পায়ের দিকে চোখ নামালাম। পা নয়, শিকড়ের দিকে। আতঙ্কে বুকের ভিতরে আর্তচিৎকার তৈরি হলো। আমি এখানে এসেছি মাটিতে শিকড় গাঁথতে, কে যেন মাথার ভিতরে বলল। কণ্ঠস্বরটা নিচু আর ভারী–এবং ভীতিকর।

গুঁড়ি ককিয়ে উঠল। গাছগুলো ঝুঁকে পড়ল আমার উপরে। ওদের নগ্ন ডাল ফিসফিস করছে, নড়ছে, মরা পাতা ঝরছে আমার চারপাশে।

এখানেই থাকো, কণ্ঠস্বরটা বলল আবারও। অন্য কণ্ঠগুলো গলা মেলাল–এখানেই থাকো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঁ হাতটা তুললাম। না! প্লিজ, যেতে দাও

আমাকে! চিৎকার ছাড়তে চাইলাম। কিন্তু মুখ খোলে কার সাধ্য। শুধু ফুঁপিয়ে উঠলাম, কেঁদে ফেললাম, গাছটা যখন আমাকে গ্রাস করতে শুরু করল। মাথার উপরে উঠে গেল আঙুলগুলো। বেড়ে চলেছে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম। যতক্ষণ না কিছু একটা ওগুলোকে টানা বন্ধ করল, বাড়তেই লাগল।

আমাদের সঙ্গে থাকো। শেষ শব্দটা ফিসফিস করে আমার চারধারে ঘুরতে লাগল। মাটি থেকে উঠে এসেছে কথাটা। আমার জায়গা এখন এখানে। কুঠারের ঘায়ে কাটা পড়েছে যে গাছটা আমাকে তার জায়গা নিতে হবে। শিউরে উঠলাম। ঝাঁকুনি খেল আমার ডাল-পালা।

আমার পিছনে ঝন-ঝন করে উঠল কিছু একটা। বহুদূর থেকে এল যেন শব্দটা। ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। অন্য কোথাও শুনেছি এই একই শব্দ।

বহু কষ্টে ঘুরে দাঁড়াতে পারলাম। পিঠটা ক্যাঁচ-কোঁচ করে উঠল। ডান চোখে খুব সামান্যই দেখতে পাচ্ছি। শব্দটা জোরাল হতেই দেখতে পেলাম ওদেরকে। চারটে কিশোর এদিকেই আসছে। একজনের পরনে রুপোলী পোশাক। রবিন। মুসাকেও দেখতে পাচ্ছি।

আমার চারপাশ ঘিরে থাকা গাছগুলো নড়ে উঠল। খটখটিয়ে উঠল ডাল-পালা। কুঠার। ওদের চারজনের মধ্যে একজনের হাতে কুঠার। খেপে উঠেছে গাছগুলো। আমি মাথা নোয়ালাম। ভয় পাচ্ছি ওদের উগ্র মেজাজকে।

একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'দৌড়ে গিয়ে গাছগুলোকে ছুঁতে পারবে? আমার কুঠারটা দিয়ে হিট করে আবার দৌড়ে ফিরে আসবে!'

গলাটা পরিচিত লাগল। রবিন? রবিন-মুসারা অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিবারের মত এখানে এসেছে। একে অন্যকে ভয় দেখাতে।

মনে পড়ে গেল আমি এখানে শিকড় নামাতে আসিনি। উপায় খুঁজতে এসেছি যাতে ব্যাপারটা এড়াতে পারি। ভয় জেঁকে বসল

বুকে। আমাকে পালাতে হবে। এখুনি সরে না পড়লে আর পারব না। কাঠের ভিতরে বন্দি হয়ে পড়েছি সত্যিকারের আমি।

মাথার উপরে, গাছগুলো আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে। বিনা বাতাসে দোল খাচ্ছে ওরা। ফট করে উঠল একটা ডাল। পিছনে হেলে মুখ তুলে চাইলাম। আমার পাশের গাছটার একটা ডাল আলগা হয়ে ঝুলছে। পড়ে যাবে যেন যে কোন মুহূর্তে। আলো পড়তেই সরে গেল বাকল, মুখটা দেখতে পেলাম। ওরা ঠিক এভাবেই আটক করেছে আমাকে। নিজেদের একটা করে ডাল ফেলে দিয়েছিল আধ-মরা গাছটার উপর, কাটা হয়েছিল যেটাকে। এবার ওরা রবিন, মুসা আর অন্যদের পিছনে লেগেছে।

না! মাথার মধ্যে শব্দটা তৈরি হলো, কিন্তু আমার তো মুখ নেই যে প্রকাশ করব।

টিনের কাঠুরের পোশাক পরা রবিন আরও কাছিয়ে এল।

'ঠিক আছে, আমি করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে।'

রীতিমত কসরৎ করে পা দুটো তোলার চেষ্টা করলাম। ওকে সতর্ক করতে হবে। ওদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াব এখান থেকে। ওরা আহত হওয়ার আগেই। ওরা কামড় খেয়ে আমার মত কাঠের বাকলে মুড়ে যাওয়ার আগেই কাজটা করতে হবে।

অতিকষ্টে ডান পা তুলতে পারলাম, ফলে ঘুরে দাঁড়ানো গেল।

রবিন থমকে দাঁড়াল। মুখটা হাঁ। ওর মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম ও টের পায়নি ওটা আমি। সশব্দে ডান হাতটা নীচে নামিয়ে গেটের দিকে ইঙ্গিত করলাম।

'চলে যাও!' কথাগুলো বলতে চেয়েও পারলাম না। তার বদলে ককিয়ে উঠল আমার ডালগুলো। বুকের গভীর থেকে উঠে এল হাহাকার।

রবিনের মুখের চেহারা ছাই বর্ণ। নকল কুঠারটা ফেলে দিয়ে ঘুরেই দৌড় দিল।

ওর বুকের টিনটা ঠং-ঠং করে উঠল। মুসা আর অন্যান্যরাও আর্তনাদ ছেড়ে ওর পিছু নিল। আমার পিছনে মুখওয়ালা ডালটা

ফটাস করে ভেঙে পড়ল। রবিন কুঠারটা যেখানে ফেলে গেছে ঠিক তার উপরে। মুখটা বেঁকে গিয়ে কামড় বসাল কুঠারটায়।

ঘুরে দাঁড়ালাম। দেহ আড়ষ্ট। এতটাই ক্লান্তি বোধ করছি, নড়ার সাধ্য নেই। ওরা জিতে গেছে। আমি মারা যাচ্ছি ভিতরে ভিতরে। একমাত্র চোখটা বুজে ফেললাম।

দুনিয়াটা পাল্টে গেছে। বাতাস, মাটি আর আকাশটা অনুভব করছি আমি। অন্যান্য গাছগুলো ঝুঁকে পড়েছে আমার উপরে। ডালগুলো অশুভ ভঙ্গিতে নিচু হয়ে দোল খাচ্ছে আমার উদ্দেশে।

আমি থাকব এখানে, যদি থাকতেই হয়। আমি এখানে অন্য কারও জায়গা নেব। কিন্তু অন্যদেরকে তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে। অন্যদের কোন ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না–গাছগুলোকে মনে মনে বললাম।

আমার ছড়ানো আঙুলের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। গাছগুলো আমার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। ওদের মরা পাতা ফিসফিস করছে আমার সঙ্গে। মাথার ভিতরে ওদের কণ্ঠস্বর–হারানো বন্ধু সম্পর্কে কথা বলছে ওরা।

আমার পায়ের পাতা থেকে মাটির গভীরে দেবে যাচ্ছে শিকড়। বুকের বাকল শক্ত হচ্ছে ক্রমেই। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেছে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে হলদে রস।

মাথা কাত করে রস বইতে দিলাম। এবং আমি হয়ে গেলাম ওদের একজন।

ঠাণ্ডা লাগছে।

ধীরে ধীরে, এক চোখ মেলার চেষ্টা করলাম। এবার অপরটা। চারদিকে অন্ধকার। দৃষ্টি চলছে না। কেঁপে উঠলাম। বেশ কয়েক দিন ঠাণ্ডা লাগছে না আমার। সেই সেদিন থেকে...

সহসা উঠে বসলাম।

আঁধারে চেয়ে থেকে, মুখের সামনে হাত রাখলাম। আমার হাত! আঙুল বন্ধ করলাম, তারপর আবারও খুললাম। হাত নামিয়ে পায়ের

মাংসপেশী আর হাড় অনুভব করলাম, ছেঁড়া জিন্সের উপর দিয়ে। মরা পাতা আমার পা ছেয়ে রেখেছে। হাত ঝাপটিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। দুটো পা। বাকল ছাড়া দুটো পা। কাঁপা-কাঁপা হাতে মুখ স্পর্শ করলাম। চামড়া মসৃণ, স্বাভাবিক ত্বক। পায়ের পাতায় হাত বুলোলাম। গাঁটওয়ালা, বাঁকা শিকড় উধাও। একেবারে স্বাভাবিক। মানুষের পা।

ঝরা পাতার বিছানায় শুয়ে চিৎকার ছাড়লাম। হা-হা করে হাসছি। খুশিতে গড়াগড়ি দিলাম।

ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদের মত পরিবর্তন হয়েছে! কিন্তু এর পরপরই অন্য এক চিন্তা ঘাই মারল মাথায়। ওরা কি সত্যি সত্যি ছাড় দিয়েছে আমাকে? নাকি পুরো ব্যাপারটা আবার শুরু হবে? গড়াগড়ি বন্ধ করে হাঁটুর উপর বসলাম। আঁধারে চোখ সইয়ে নিতে চেষ্টা করছি।

আমার সামনে প্রাচীন, মোটা গুঁড়ির সারি। নীরব। অনড়। সটান উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে হেঁটে গেলাম। আঁধারে, কালো আকাশের পটভূমিতে ওরা ডাল-পালা বাগিয়ে ধরল বিশাল ছায়ার মতন আমাদের পায়ের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে কুয়াশার কুণ্ডলী

গাছগুলো নড়ে উঠল। পাতা আর ডালের শব্দ পেলাম। বাতাসে নড়ছে। চোখ বুজলাম। কোন কণ্ঠস্বর আমার ভিতরে কথা বলছে না। কিন্তু অনুভব করলাম, ভারী কম্বলের মত কিছু একটা মুড়ে ফেলছে আমাকে।

চোখ খুলে, কেটে ফেলা গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে। এবার অন্যান্য গাছের দিকে চোখ ফিরালাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি ছিলাম ওদেরই একজন। কিন্তু এরমধ্যেই স্বপ্নের মত সব ভুলে গেছি। শুধু একটা অনুভূতি রয়ে গেছে আমার সঙ্গে এমন এক অনুভূতি, তুমি যেন তোমার প্রিয়জনদের সঙ্গে রয়েছ। আমার ধারণা, বন্ধুদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছি বলে ওরা ছেড়ে দিয়েছে আমাকে

এগিয়ে গিয়ে মরা গুঁড়িটায় হাত রাখলাম। এইসব গাছেরা জানে বন্ধুকে কীভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হয়। সেজন্যই ওরা রক্ষা

করেছে আমাকে–নিজেদের প্রতিশোধের হাত থেকে। নতুন বন্ধুদের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরলাম বাড়ির পথে।

***

ভুতুড়ে বিমান

কাহিনি রচনা: কাজী শাহনূর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

'আরিব্বাবা, কিশোর, কী আসছে দেখ!' রাশেদ চাচা চেঁচিয়ে উঠল। আমাদের সরাসরি সামনে, বিশালদেহী এক জেট প্লেন রকি বীচে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার জন্য আসছে।

গাড়ির পিছনের দিকে বসে আমি। চাচা গাড়ি চালাচ্ছে, মেরি চাচী পাশে বসা। জেটটাকে নেমে এসে কাছের এক রানওয়েতে ল্যাণ্ড করতে দেখলাম।

'মার্ক এরকম জেটে করেই আসবে,' বলে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল চাচী।

মার্ক আমাদের পরিচিত কেউ না। আমার বয়সী এক ছেলে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসছে। প্রতি বছর রকি বীচ থেকে একজন ছাত্র বিদেশে যায় আর বিদেশ থেকে একজন ছাত্র এখানে আসে; সারা বছর কোন একটি পরিবারের সঙ্গে থাকে, স্কুলে ভর্তি হয়। এবার স্বেচ্ছায় এ ধরনের ছাত্রের মেজবান হতে চেয়েছে আমাদের পরিবার।

'মার্ক ট্রেনে করে এলে ভাল হত,' বাইরের কালিগোলা আঁধারের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলাম।

'কিশোর, এয়ারপোর্টে তোর কী অসুবিধা?' হেসে বলল চাচা।

'সব এয়ারপোর্টে তো না,' বললাম। 'শুধু রকি বীচ এয়ারপোর্ট।'

'আসলে ওই আজগুবী গল্পটা শুনে শুনে তোর মাথাটা বিগড়েছে,' বলল চাচা।

আমি আসলে মাথা থেকে হারানো বিমানটার কথা তাড়াতে পারছি না।

'গল্পটা আরেকবার বলো না শুনি,' বলল চাচা। এয়ারপোর্টের ভিতরে

ঢুকে পড়েছে গাড়ি।

'এখন কোন ভূতের গল্প নয়,' শাসনের সুরে বলল চাচী। 'আমরা নতুন ছেলেটাকে নিতে এসেছি। আমি চাই সবাই স্বাভাবিক থাকুক।'

চাচী যা-ই বলুক, আমি মাথা থেকে দূর করতে পারলাম না ভুতুড়ে গল্পটা। বহু বছর আগের কথা। রকি বীচে এয়ারপোর্ট বানানোর সিদ্ধান্ত হয়। এক বছর লেগে যায় কাজ শেষ করতে। অবশেষে জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকেই গোলমালের শুরু।

এখানে তখন ক্যাপ্টেন স্টার নামে এক লোক থাকতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউএস আর্মি পাইলট ছিলেন ভদ্রলোক। তিনি ঘোষণা দেন, রকি বীচ এয়ারপোর্টে তিনিই প্রথম বিমান ল্যাণ্ড করাবেন।

কর্তৃপক্ষ তাকে বারণ করে। কেননা ক্যাপ্টেন স্টারের বয়স হয়েছে, কাজটা বিপজ্জনক এবং তাঁর বৈধ কাগজপত্রও নেই।

প্রথম যেদিন এয়ারপোর্ট চালু হয় সেদিন আবহাওয়া ছিল ভারী আর কুয়াশাচ্ছন্ন। এয়ারপোর্টের প্রতিটা ফ্লাইটই বিলম্বিত হয়।

হঠাৎই টাওয়ারের ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা একটা শব্দ শোনেন। আর তাঁদের রাডারে ধরা পড়ে একটা ব্লিপ। ল্যাণ্ডিঙের জন্য একটা প্লেন আসছে!

মুহূর্তের জন্য মেঘমুক্ত হয় আকাশ। ক্যাপ্টেন স্টার তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুরানো বিমান নিয়ে উড়ে আসছেন।

ঠিক এ সময় আরেক গুচ্ছ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের মধ্যে ঢুকে যায় বিমান। ক্যাপ্টেন স্টারকে এরপর আর কেউ দেখেনি। রাডার থেকে উধাও হয়ে যায় তাঁর বিমান। তাঁকে কিংবা বিমানটাকে আর কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি।

আবহাওয়া পরিষ্কার হলে গোটা এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়। বিমান দুর্ঘটনার কোন চিহ্ন নেই। স্রেফ কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে যেন ওটা।

তার পর থেকে গুজব রটে গেছে, ভুতুড়ে বিমান নিয়ে এখনও উড়ে বেড়াচ্ছেন ক্যাপ্টেন স্টার। এখনও ল্যাণ্ড করার এবং তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

'অ্যাটেনশন প্লিজ! ফ্লাইট নম্বর ৩৪৫। দু'মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড

করবে,' ঘোষণা শোনা গেল পিএ সিস্টেম থেকে। সচকিত হয়ে উঠলাম আমি। মার্ক এই ফ্লাইটেই আসছে।

আমরা এখন লাউঞ্জ-টার্মিনাল এরিয়াতে দাঁড়িয়ে। চাচা-চাচী ফ্লাইট কাউন্টারে গেছে শিডিউল বোর্ড দেখতে।

হঠাৎই আকাশে বাতি জ্বলতে দেখলাম, এয়ারপোর্টের উদ্দেশে আসছে। নিশ্চয়ই মার্কের বিমানে!

লাউঞ্জের শেষ প্রান্তে সরে গেলাম, বিমানটাকে যাতে ভাল মত রানওয়েতে নামতে দেখতে পারি। আমিই শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছি ওখানে। আর সবাই টার্মিনালের মাঝখানে।

অন্ধকার আকাশে মেঘ নেই দেখে স্বস্তি পেলাম। মার্কের বিমান মেঘের কিংবা কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

এসময় সহসা বিশাল এক কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল, ঠিক আগুয়ান বিমানটার পথের উপরে। বিমানটা উড়ে এসে ঢুকে পড়ল কুয়াশার মধ্যে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল!

দুই

ঘুরেই এক দৌড়ে টার্মিনালের মাঝখানে চলে গেলাম। চাচা-চাচীকে খুঁজছি।

'চাচা! চাচী!' চেঁচালাম। প্যাসেঞ্জার এন্ট্রি ডোরের পাশে দাঁড়িয়ে তারা।

'কীরে, কী হয়েছে?' চাচা জানতে চাইল।

'প্লেন! মার্কের প্লেনটা উধাও হয়ে গেছে! কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছে!'

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল চাচা-চাচী।

'তোর কল্পনার ঘোড়াকে লাগাম পরা,' বলল চাচী। কাছের এক জানালার দিকে আঙুল তাক করল। 'দেখ।' হেসে বলল।

জানালা দিয়ে চাইলাম। ওই তো, বিশালদেহী জেট প্লেনটা। ল্যাণ্ড

করেছে, এখন ট্যাক্সিইং করে কাছের এক গেটের সামনে থেমে দাঁড়াচ্ছে।

'কিন্তু আমি কুয়াশা দেখেছি!' বললাম। 'ভাগ্য ভাল ক্র্যাশ করেনি!'

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল চাচা। চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

'কোথায়? কোন মেঘ বা কুয়াশা তো দেখতে পাচ্ছি না। পরিষ্কার, চাঁদ-তারার রাত।'

প্যাসেঞ্জাররা নেমে আসছে বিমান থেকে। টার্মিনাল সরগরম হয়ে উঠছে। আমাদের কুয়াশা সংক্রান্ত আলোচনার ওখানেই ইতি। চাচা-চাচী একটা সাইন তুলে ধরল। ওতে লেখা: 'স্বাগতম, মার্ক! পাশা পরিবার থেকে।'

চাচা-চাচী মার্ককে খুঁজছে, এসময় ওদের বিমানের পাইলটকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে।

'প্লেনটা ল্যাণ্ড করার সময় লক্ষ করছিলাম আমি। শেষ দিকে কুয়াশা দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আপনি?' প্রশ্ন করলাম।

হাসি মুছে গেল ক্যাপ্টেনের। আমার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মাথা নাড়লেন।

'গোটা ট্রিপের কোথাও কোনও কুয়াশা ছিল না।'

চোখ পিটপিট করলাম আমি।

'কিন্তু আমি তো দেখেছি,' বলে জানালা দিয়ে আঙুল নির্দেশ করলাম। 'আপনি ল্যাণ্ড করার ঠিক আগে কুয়াশার মেঘে ঢুকে পড়েছিল প্লেন।'

ক্যাপ্টেন আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

'মানুষ এয়ারপোর্টে অনেক উল্টোপাল্টা দেখে। আমি বলছি কোন কুয়াশা ছিল না।' হেঁটে চলে গেলেন তিনি।

তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি দেখেছি, আর কন্ট্রোলে বসে উনি দেখবেন না, এটা হয়? মিথ্যে বলে গেলেন কেন ক্যাপ্টেন?

এসময় আমার নাম ধরে ডাকা হলো।

'কিশোর! কিশোর! এদিকে!'

ঘুরে দাঁড়ালাম। প্যাসেঞ্জার এরিয়াটায় দাঁড়িয়ে চাচা-চাচী। তাদের পাশে আমার বয়সী এক কিশোর। মার্ক।

এগিয়ে গেলাম। চাচী মার্কের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

'কেমন আছ, মেট?' বন্ধুভাবাপন্ন হাসি হাসল মার্ক। 'মেট' বলতে অস্ট্রেলিয়ানরা 'বন্ধু' বোঝায়।

'ভাল। তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম,' বললাম। হাত মিলালাম। মার্ক আমার চাইতে খানিকটা খাটো। মাথার চুল হালকা বাদামী, চোখজোড়া ম্লান নীল। একটু যেন উদাসীনও।

'প্লেনে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। লম্বা জার্নি,' বলল ও।

'বাসায় যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না,' চাচী বলল। 'রাতে ভাল একটা ঘুম দিলে কাল সকাল থেকেই বছর শুরু করে দিতে পারবে।'

'তবে তো খুব ভাল হয়,' বলে হাই চাপল মার্ক। 'তোমার স্কুলের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে তর সইছে না আমার।' শেষের কথাগুলো আমার উদ্দেশে বলল। গাড়িতে গিয়ে বসেছি আমরা।

'ওদেরকে তোমার ভাল লাগবে। মার্ক, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' হাই তুলে বলল ও।

'প্লেনটা ল্যাণ্ড করার ঠিক আগ মুহূর্তে কী করছিলে তুমি?'

আমার দিকে চাইল মার্ক।

'কী আর করব? সিট বেল্ট বেঁধে সিটে বসে ছিলাম। কেন?'

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলে?'

'হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্য।'

'প্লেনটা কুয়াশার মেঘে ঢুকে পড়েছিল টের পেয়েছিলে?'

আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মার্ক। ওর চোখজোড়া যেন নীলচে দ্যুতি ছড়াল। গাড়ির পিছনের সিট থেকে এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, গা ছমছম করে উঠল আমার।

এবার শান্ত স্বরে বলল ও, 'না, মেট, কোন কুয়াশা-টুয়াশা চোখে পড়েনি।'

মাথা ঝাঁকালাম। বোঝা যাচ্ছে আমি ছাড়া আর কেউ কুয়াশার মেঘটাকে দেখেনি। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?

'তবে একটা ব্যাপার ঘটেছিল,' মার্ক বলল।

ঝট করে ঘুরে চাইলাম।

'কী?'

'ল্যাণ্ড করার আগের মুহূর্তে প্লেনের বাতিগুলো নিভে যায়। গোটা কেবিন আঁধার হয়ে গিয়েছিল। পরমুহূর্তে আবার আলো ফিরে আসে।'

'ওহ,' হতাশ কণ্ঠে বললাম। এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। নাহ, কুয়াশা-রহস্য ভেদ করা গেল না।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢুকল। চাচা গাড়ি পার্ক করলে সবাই নেমে পড়লাম। চাচা-চাচী মার্ককে যখন তার রুম দেখাতে নিয়ে গেল, কিচেনে থমকে দাঁড়ালাম আমি।

কিচেন টেবিলে কিছু কাগজ ফেলে গেছিল চাচা। তার মধ্যে মার্কের পাঠানো একটা চিঠি রয়েছে। ওর একটা রঙিন ছবিও আছে চিঠির সঙ্গে।

ছবিটা তুলে নিয়ে দু'মুহূর্ত জরিপ করলাম। ছবির সঙ্গে ওর সব কিছুরই মিল খুঁজে পেলাম। শুধু একটা বাদে। সেজন্যেই গাড়িতে অমন ভয় পেয়েছিলাম আমি, মার্ক যখন তার ম্লান নীল চোখ মেলে আমার দিকে চেয়েছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওর চোখজোড়া গাঢ় বাদামি।

তিন

পরদিন স্কুল। ঘুমিয়ে উঠে তরতাজা বোধ করছে মার্ক। আমাদের সঙ্গে যোগ দিল নাস্তার টেবিলে।

'কমলার রস আর কর্ন ফ্লেকসে আপত্তি নেই তো? আমরা বেশির ভাগ দিন সকালে ওগুলো দিয়েই শুরু করি,' বলল চাচী।

'আমরাও অস্ট্রেলিয়াতে তা-ই করি,' বলে সিরিয়ালে চামচ ডোবাল মার্ক।

'দু'দেশের মিল-অমিল আস্তে আস্তে জানা যাবে,' চায়ে দুধ ঢেলে বলল চাচা।

'বোধহয় অমিল কম, মিলই বেশি,' জানাল মার্ক। 'অবশ্য আপনাদের এখানে ক্যাঙারু দেখা যাবে বলে মনে হয় না।'

হেসে ফেললাম আমরা। মার্ক নীল চোখজোড়া মেলে আমার দিকে চাইল। চোখ দুটো যেন ঝলসাচ্ছে। হঠাৎই পানির তেষ্টা পেয়ে গেল আমার।

'যাই, পানি খেয়ে আসি,' বলে সিঙ্কের দিকে এগোলাম।

'পানি? নাস্তার সাথে? বলিস কী?' চাচী বলে উঠল। 'কোনদিন তো খাস না।'

'তেষ্টা পেয়েছে কী করব,' শ্রাগ করে বললাম। চাচী ঠিকই বলেছে। নাস্তায় সব সময় কমলার রস আর দুধ খাই আমি। কিন্তু এখন আমার পানির খুবই দরকার।

ঠাণ্ডা পানির ফসেট অন করে গ্লাস ভরে নিলাম।

'ওউ,' পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠে মুখের পানি ফেলে দিলাম সিঙ্কে।

'কী হয়েছে!' চাচা-চাচী উঠে দাঁড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল।

'পানিটা,' কোনমতে আওড়ালাম, 'ভয়ানক গরম।'

'ঠাণ্ডা পানি খাবি তো গরম পানি অন করলি কেন?' চাচা জিজ্ঞেস করল।

'করিনি,' বললাম। নীচের ঠোঁটটা অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ফুলে যাবে। 'কোল্ড ফসেট অন করেছি। এই দেখো।'

ফসেটটা আবারও চালু করলাম। সাবধানে আঙুল ছোঁয়ালাম পানির ঝর্নায়। গরম!

'এ কী করে হয়?' চাচী প্রশ্ন করল। 'কোল্ড ফসেট থেকে গরম পানি বেরোয় কীভাবে!'

'দেখি তো,' বলে গরম পানির ফসেট চালু করলাম। আঙুল বাড়ালাম। বরফ শীতল পানি! 'উল্টে গেছে,' বললাম। 'ঠাণ্ডার জায়গায় গরম আর গরমের জায়গায় ঠাণ্ডা।'

ঠাণ্ডা পানিতে একটা ন্যাপকিন ভিজিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলাম।

'বাড়ির নীচে পানির পাইপে মনে হয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। মিস্ত্রি ডাকতে হবে,' বলল চাচা।

পুরোটা সময় মার্ক কোন কথা বলেনি। আমার দিকে ম্লান নীল চোখজোড়া মেলে চেয়ে ছিল শুধু। ভঙ্গিটা এমন যেন সম্মোহিত অবস্থায়

রয়েছে।

'আমাদের দেশেও এসব ছোটখাট মিক্স-আপ ঘটে,' বলল ও।

চাচা-চাচী হেসে উঠল। আমি হাসলাম না। মুখের ভিতরটা এখনও ফুলে আছে।

একটু পরে মার্ককে নিয়ে স্কুলের পথ ধরলাম।

হাঁটার ফাঁকে ওর দিকে এক ঝলক চাইলাম। মনে পড়ে গেল কাল রাতে কোন্ ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছিল।

'মার্ক, আমি একটা কথা ভাবছিলাম,' বললাম। 'তুমি অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের কাছে যে ফটোটা পাঠিয়েছ, সেটায় তোমার চোখের মণি গাঢ় বাদামি ছিল। কিন্তু আসলে তোমার চোখ হালকা নীল। ব্যাপারটা কী?'

মার্ক নিশ্চুপ। শেষমেশ আমার দিকে চাইল।

'ও, এই কথা? আমি তখন ডার্ক কনট্যাক্ট লেন্স পড়তাম। তারপরে চোখের সমস্যা সেরে গেল, ফলে আর পরার দরকার পড়েনি।'

'ও, কী হয়েছিল চোখে?'

'আলো সহ্য হত না,' বলল মার্ক। 'লাইট সেনসিটিভিটি।'

ব্যাপারটা ভাল বুঝলাম না। তবে ও নিয়ে আর কথাও বাড়ালাম না। স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছি।

'ওই দেখো, গাড়ি থেকে নামছে রবিন মিলফোর্ড। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।'

রবিন গাড়ি থেকে নেমে মাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। আন্টি পাল্টা হেসে হাত নাড়লেন। রবিন সাইডওয়কে পা রাখলে, মিসেস মিলফোর্ড রাস্তায় ট্রাফিক আছে কিনা দেখে নিলেন। ফাঁকা। আমি মিসেস মিলফোর্ডের গাড়ির পিছন দিয়ে সাইডওয়কের উদ্দেশে এগোলাম। গাড়িটা তখন সামনের দিকে চলতে শুরু করেছে।

অ্যাকিলারেটরে চাপ দিলেন মিসেস মিলফোর্ড

'কিশোর সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। মুখ তুলে চাইলাম। শেষ মুহূর্তে দেখতে পেলাম গাড়িটা ব্যাক করে সোজা আমার দিকে ধেয়ে আসছে!

চার

এক লাফে সরে গেলাম সাইডওয়কের দিকে। সিমেন্টে পড়ে এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম ঝটপট। পতনের ফলে সামান্য ব্যথা পেলেও, গাড়ির ধাক্কা থেকে তো বেঁচেছি।

মিসেস মিলফোর্ড ব্রেক চেপে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন।

'কী হলো কিছুই বুঝলাম না,' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ফরওয়ার্ড গিয়ার দিয়ে অ্যাক্সিলারেটর চাপলাম, কিন্তু কী কারণে কে জানে গাড়ি গেল পিছন দিকে।'

'পিছনে আনার চেষ্টা করে দেখুন কী হয়,' বাতলে দিলাম।

'ঠিক আছে,' বলে এঞ্জিন চালু করলেন আবার, ব্যাকগিয়ার দিলেন। গাড়ি এগোল সামনের দিকে! 'অদ্ভুত কাণ্ড! গিয়ার উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে!'

'আগে তো কখনোই এরকম হয়নি,' মন্তব্য করল রবিন।

'আজকে সব কিছুই উল্টে গেছে,' বললাম।

'তোমার জন্যে আজকের দিনটা অপয়া, কিশোর,' বলে হেসে উঠল মার্ক।

রবিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর। এরপর বেল বাজলে আমরা ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম।

রোল কলের পর মিসেস রবার্টস মার্ককে ডেকে নিলেন। জানালেন, মার্ক বদলি ছাত্র হিসেবে অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে, আমাদের পরিবারের সঙ্গে থাকছে।

'হাই ইয়া, মেটস!' মার্ক চেঁচিয়ে বলল।

'হাই, মার্ক!' পাল্টা সম্ভাষণ জানানো হলো ওকে।

'রকি বীচ সত্যিই চমৎকার জায়গা। তোমরা অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে যা জানতে চাও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

'তুমি কি কাছ থেকে ক্যাঙারু দেখেছ?' জুলি প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই। তবে ওদের সাথে লাফানোর কম্পিটিশন দিতে যেয়ো না, পারবে না।'

মুসা হাত তুলল।

'মার্ক, কোয়ালা ভালুক কি সত্যিকারের ভালুক?' খুদে, লোমশ, মিষ্টি প্রাণীগুলোর কথা জানতে চেয়েছে ও।

দু'মুহূর্ত ভেবে নিল মার্ক।

'আমি জানি না। তবে অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে প্রথম যে কোয়ালা ভালুকের সাথে দেখা হবে তাকে জিজ্ঞেস করব।'

ছেলে-মেয়েরা হেসে উঠে হাততালি দিল। মার্ককে সবাই পছন্দ করতে শুরু করেছে।

লাঞ্চের সময় ক্যাফেটেরিয়াতে মার্ক, মুসা, রবিন আর আমি জড় হলাম। মুসার সঙ্গে ইতোমধ্যেই পরিচয় হয়ে গেছে মার্কের। রবিন আর মুসা অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল মার্ককে। বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে সাধ্যমত জবাব দিয়ে গেল ও। শেষমেশ মার্ককে রেহাই দেওয়ার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টালাম আমি।

'আজকে আমাদের বিগ ম্যাচ ভুলে যেয়ো না।'

ওরা আমার দিকে ঘুরে চাইল। রকি বীচ সকার টিমের সঙ্গে আজ স্কুল ছুটির পর হোয়াইট লায়ন্স ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ। হোয়াইট লায়ন্স আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ।

'মনে আছে। আমরা মাঠে যাব,' জানাল রবিন। তারপর মার্কের উদ্দেশে বলল, 'মার্ক, তুমি আসছ তো ফুটবল মাঠে?'

আমার দিকে অন্তর্ভেদী নীল চোখ মেলে চাইল মার্ক।

'তুমি কী বলো, মেট?'

'নিশ্চয়ই যাবে!'

'তুমি কোন্ পজিশনে খেলো?' মার্ক প্রশ্ন করল।

'ডিফেন্স। আজকে যদি ওদেরকে হারাতে পারি তা হলে ভাল ভাবে শুরু হবে আমাদের সিজন।'

'আমি যাব, কিশোর। খেলাটা মিস করতে চাই না,' জানাল মার্ক।

বিকেলটা কেটে গেল চোখের পলকে। এক সময় তিনটে বাজল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আর আধ ঘণ্টা পর বড় ম্যাচ। হলওয়ের বাইরে জড় হলাম আমরা।

'মার্ককে মাঠে নিয়ে যাব আমরা,' বলল রবিন। 'আমাদের সাথে স্ট্যাণ্ডে বসবে ও।'

'সামনের দিকে বসা যাবে না?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'নিশ্চয়ই যাবে,' জানাল মুসা। পায়ে ব্যথা, তাই চলে গেল ও।

'ভাল খেলা চাই কিন্তু, মেট,' আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল মার্ক। সবার শুভ কামনা নিয়ে জার্সি পরতে গেলাম আমি।

একটু পরে, সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠে নামলাম। দর্শক সারির সামনের দিকে বসেছে আমার ক্লাসমেটরা। রবিন আর মুসার মাঝখানে মার্ক বসা। সবাই হাত নাড়ছে, চিৎকার করে উৎসাহ যোগাচ্ছে—শুধু মার্ক বাদে। হয়তো এটা ওর জন্য নতুন অভিজ্ঞতা, ভাবলাম, তাই ও জানে না কী করতে হবে।

দু'দল তৈরি। এখুনি খেলা শুরু হবে। রেফারি বাঁশি বাজালেন।

সেণ্টার করেছে লায়নরা। দ্রুতগতিতে বল দেওয়া-নেওয়া করে আমাদের গোলের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। আমি এগিয়ে গেলাম বাধা দিতে। প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই পড়ে গেল সে। রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। ফাউল। পেনাল্টি। খেলা শুরু হতে না হতেই পিছিয়ে পড়লাম আমরা ০-১ গোলে। দুই মিনিট পর আমাকে তুলে নেওয়া হলো মাঠ থেকে। অবাক কাণ্ড! সাইডলাইনে দেখি জার্সি পরে মার্ক দাঁড়িয়ে। আমার বদলে মাঠে ঢুকল ও।

'তোমাকে আজকে নামানোই উচিত হয়নি,' বললেন কোচ। 'মার্ক ছেলেটা কেমন খেলে দেখি। অস্ট্রেলিয়াতে ও নাকি ডিফেন্সে খেলে। লাঞ্চের সময় আমাকে গিয়ে বলেছে দরকার পড়লে ওকে যাতে নামাই

বোকা হয়ে গেলাম আমি। বেঞ্চে বসে মার্ককে আমার জায়গা নিতে দেখলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম। পেনাল্টি বক্সের ভিতরে কোন্ কুক্ষণে ওভাবে ফাউল করতে গেলাম। অথচ আমি দলের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ডিফেণ্ডার।

মার্ক ছেলেটা আসার পর থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে

চলেছে। প্রথমে ঠাণ্ডা-গরম পানির ব্যাপারটা ঘটল, তারপর গাড়ি চাপা পড়তে যাচ্ছিলাম। আর এখন খেলার শুরুতেই পেনাল্টি দিয়ে বসলাম। এসব হচ্ছেটা কী?

পাঁচ

খেলা শেষ। ০-১ গোলে হেরেছে রকি-বীচ। সব দোষ আমার। মার্ক আমার বদলি হিসেবে নামার পর আর গোল হয়নি। দুর্দান্ত খেলেছে ও।

লকার রুমে চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সবাই ঘিরে ধরেছে মার্ককে, বাহবা দিচ্ছে। হঠাৎ করেই দলের সবচাইতে জনপ্রিয় খেলোয়াড় হয়ে গেছে ও!

বাইরে বেরিয়ে এলাম। মুসা আর রবিন অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

'ব্যাড লাক, কিশোর। ফাউলটা না করলেও পারতে,' বলল মুসা।

'আমিও ফাউল করতে চাইনি। কী থেকে কী হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাই।'

'খেলা তো আরও আছে, অত চিন্তা করছ কেন,' আমার পিঠ চাপড়ে দিল রবিন।

'কিন্তু মার্ক কী খেলাটাই না খেলল। একাই সব আক্রমণ রুখে দিল, ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চীনের প্রাচীর,' বলল মুসা।

'ধন্যবাদ, মুসা,' বলল মার্ক, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে লকার রুম থেকে। মুখে চওড়া হাসি, নীল চোখ ঝলকাচ্ছে।

'পরের ম্যাচে কোচ হয়তো তোমাকেই প্রথম এগারোয় নামাবেন,' বলল রবিন।

'আমার তা মনে হয় না। কিশোরই খেলবে। আমি তো বদলি হিসেবে খেলছিলাম,' জানাল মার্ক।

'চলো, বাড়ি ফিরি,' মার্কের উদ্দেশে বললাম।

'চলো, মেট,' জবাব দিল মার্ক। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। 'তোমার বন্ধুগুলো খুব ভাল,' একটু পরে

বলল মার্ক।

'হ্যাঁ, তোমাকে ওদের ভাল লেগেছে,' একটু কি ধারাল শোনাল আমার কণ্ঠ? ঝট করে আমার দিকে চাইল ও।

'দেখো, কিশোর, আমি কিন্তু নিজের ইচ্ছায় মাঠে নামিনি। কোচ চেয়েছেন বলেই,' বলল ও।

বাসার কাছের মোড়ের উদ্দেশে এগোচ্ছি আমরা।

'আমি এর আগে কোনদিন পেনাল্টি দিইনি। তা ছাড়া ওটা এমন কোন বিপজ্জনক আক্রমণ ছিল না যে গোল হতে পারত,' বললাম।

সবুজ বাতি জ্বলে উঠল, কার্ব থেকে নেমে রাস্তা পেরোতে লাগলাম আমি।

'পঞ্চাশটার উপরে ম্যাচ খেলেছি। এরকম ভুল আগে কখনও করিনি–'

হঠাৎই এক গাড়ির হর্ন যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দিল। ঘুরে চাইলাম। একটা গাড়ি ছুটে আসছে। রাস্তা থেকে সরার উপায় নেই। চাপা দেবে আমাকে!

ছয়

গাড়িটা এক পাশে কেটে তীক্ষ্ণ শব্দে থেমে দাঁড়াল। মাত্র ফুটখানেকের জন্য ধাক্কা লাগেনি।

'অ্যাই, তুমি বাতি না দেখে রাস্তা পেরোচ্ছিলে কেন?' বলল ড্রাইভার। 'ভাগ্যিস তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম!'

'কী বলছেন আপনি?' আমি বিস্মিত। 'সবুজ আলো দেখেই তো রাস্তা পেরোচ্ছিলাম।' দূরে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক লাইটটা দেখলাম।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! লাল! একটু আগেই তো সবুজ দেখলাম। ঘুরে চাইলাম মার্কের দিকে। তখনও কার্বে দাঁড়িয়ে ও। এবার দৌড়ে এল আমার কাছে।

'কিশোর, তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ,' বললাম। যদিও ভিতরে ভিতরে রীতিমত কাঁপছি। একই দিনে দু'বার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি কপাল গুণে।

'এখন থেকে ট্রাফিক আইন মেনে চোলো,' বলে গাড়ি স্টার্ট করল ড্রাইভার।

মার্ক আর আমি হেঁটে চললাম বাড়ির উদ্দেশে।

'তোমাকে অনেকবার ডেকেছি, তুমি শুনতে পাওনি।'

'আমি কিন্তু বাতি সবুজ দেখেই কার্ব থেকে নেমেছিলাম।'

'তুমি ভেবেছ সবুজ।'

'তার মানে?'

'তুমি আপসেট আছ, মেট। সেজন্যে উল্টোপাল্টা ভাবছ। এটা অস্বাভাবিক না। সবারই কখনও না কখনও এমন হয়।'

ওর সঙ্গে তর্ক করলাম না। কিন্তু আমি জানি বাতিটা তখন সবুজই ছিল। হঠাৎ করে ব্যাখ্যাতীত ভাবে লাল হয়ে গেছে।

ডিনারে বসে চাচা-চাচীকে এসব অদ্ভুতুড়ে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে হবে বলে উদ্বেগ বোধ করলাম। বৃথা চিন্তা। আমাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার কথা শুনে দুঃখ পেল তারা। কিন্তু মার্ক বদলী হিসেবে নেমে দুর্দান্ত খেলাতে যারপর নাই খুশি হলো। মার্ককে নিয়ে রীতিমত মেতে উঠল চাচা-চাচী!

'মনে হচ্ছে বাড়িতে নতুন একজন ফুটবল স্টার পাওয়া গেল,' বলল চাচী। খাওয়া শেষে ডেজার্ট নিয়ে এল।

আমার আর সহ্য হলো না।

'আমি যাই, অনেক হোমওয়র্ক আছে,' বলে উঠে পড়লাম।

'তাই? মিসেস রবার্টস তো বললেন ফুটবল ম্যাচের জন্যে আজকে হোমওয়র্ক দেবেন না,' বলল মার্ক।

আমার আসলে বাড়তি কাজ আছে। বুক রিপোর্ট করার কথা ছিল গত সপ্তাহে, করিনি। আগামীকাল জমা দেওয়ার তারিখ।

'ঠিক আছে, তুই হোমওয়র্ক কর। মার্ক দেখুক আমেরিকান টিভির প্রোগ্রাম ভাল লাগে কিনা,' চাচী বলল।

উপরে, নিজের রুমে চলে এলাম। বাতি জ্বেলে দরজা লাগিয়ে

দিলাম।

ঘরের ভিতরটা গুমোট লাগছে। খুদে এয়ারকণ্ডিশনারটা চালু করে দিলাম।

বই খুলে পড়তে শুরু করলাম। এটা আমেরিকার বিপ্লবের উপরে লেখা এক ইতিহাস বই। বেশ মজে গেছি। হঠাৎই অনুভব করলাম দরদর করে ঘামছি আমি। এয়ারকণ্ডিশনারটার দিকে চাইলাম। কাজ করছে তো? শব্দ তো ঠিকই শুনতে পাচ্ছি।

উঠে গেলাম জানালার কাছে। যন্ত্রটায় হাত দিয়ে দেখলাম গরম বাতাস বেরোচ্ছে।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' চেঁচিয়ে উঠে লকটা বন্ধ করে দিলাম। এবার আরও বেশি গরম হাওয়া ছাড়তে লাগল যন্ত্রটা।

দম আটকে আসছে! ঘামে জবজব করছে শরীর। এবার মাথায় ঘাই মারল চিন্তাটা, আজকে সব কিছুই উল্টো হচ্ছে। অফ দিলে যদি আরও গরম হয়ে ওঠে, তবে হাই করে দিলে নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে।

নবটা ডানে মোচড় দিলাম। নড়ল না! অফ-এ আটকে আছে। তপ্ত বাতাসের হলকা পুড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে।

আমার সাহায্য দরকার। চাচাকে ডাকব ঠিক করলাম। ভারি, গরম বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, টলতে টলতে দরজার দিকে এগোলাম ডোরনবে হাত রেখে, ডান দিকে মুচড়ে ঠেলা দিলাম।

কিছুই ঘটল না! আরও জোরে ধাক্কা দিলাম। খুলল না অসম্ভব কাণ্ড! আমার বেডরুমের দরজায় লক নেই। তা হলে খুলছে না কেন?

এদিকে, গরম বাতাস ক্রমেই দুর্বল করে ফেলছে আমাকে।

'বাঁচাও!' চেঁচিয়ে উঠলাম। দুমাদুম কিল মারলাম দরজায়। 'আমাকে এখান থেকে বের করো! চাচা-চাচী, বাঁচাও!' তারস্বরে চেঁচাচ্ছি, তপ্ত বাতাসে ভরে উঠছে ঘরটা।

সাত

জ্ঞান হারিয়ে ফেলার দশা আমার। হঠাৎই দরজার বাইরে চাচার কণ্ঠ শুনলাম।

'কিশোর! কিশোর! নবটা ছেড়ে দে!' চেঁচিয়ে বলল।

'আমি তো ধরে রাখিনি,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলাম।

'দরজাটা খোলার জন্যে টানছি, কিন্তু খুলছে না!' চাচা চেঁচাল।

আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে টানলে কিংবা ভিতর থেকে ঠেললে খোলে।

চোখ মেললাম, কপাল থেকে ঝরে পড়ল ঘাম। পেয়েছি!

'চাচা, দরজার কাছ থেকে সরে যাও!' চেঁচালাম।

ডোরনব ধরে টানলাম। খুলে গেল দরজা। টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম হলওয়েতে। চাচা-চাচী চেপে ধরল আমাকে।

'কিশোর, কী হয়েছিল?' প্রশ্ন করল চাচী। চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত।

হাঁফানোর ফাঁকে আমার কামরার দিকে তর্জনী নির্দেশ করলাম। খুলে বললাম সব কথা। এয়ারকণ্ডিশনার থেকে কীভাবে গরম বাতাস বেরোচ্ছিল, দরজা কীভাবে আটকে যায়।

'কিচেনে চল। তোর একটা ঠাণ্ডা ড্রিঙ্ক দরকার,' বলল চাচী।

'বেসমেন্টে গিয়ে এয়ারকণ্ডিশনিং ইউনিটটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি,' চাচা বলল। 'কালকে পানির ফসেটের সঙ্গে এটাও চেক করিয়ে নেব। সব কটার মধ্যে হয়তো সম্পর্ক আছে। কোথাও নিশ্চয়ই তার ওলট পালট হয়ে গেছে।'

'কিন্তু দরজার অ্যাকশন উল্টে গেল কীভাবে? ওর সাথে তো তারের কোন সম্পর্ক নেই,' বললাম সন্দেহের সুরে।

চাচা দরজাটা এক পলক দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

'বাড়িটা পুরানো। কব্জাগুলোয় হয়তো জং ধরে গেছে।'

একটু পরে, কিচেনে বসে চাচীর বানানো ঠাণ্ডা লেমোনেডে চুমুক দিতে লাগলাম।

'এখন কেমন লাগছে, বাপ?' চাচীর প্রশ্ন।

'অনেকটাই ভাল। চাচী, গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটেছে, যার কোন ব্যাখ্যা নেই,' বললাম।

'নিশ্চয়ই আছে। একটু অপেক্ষা করলেই জানা যাবে।'

চাচা বেসমেণ্ট থেকে ফিরে কিচেনে এসে ঢুকল।

'কিশোরের রুমের কানেকশন অফ করে দিলাম। কালকে মিস্ত্রি ডাকব।'

মাথা ঝাঁকালাম। লেমোনেড শেষ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেললাম। হঠাৎ করেই ভাল লাগতে লাগল, সব যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মার্ক আসার পর থেকে এই বোধটারই অভাব অনুভব করছিলাম।

মার্ক!

চেয়ারে সিধে হয়ে বসে চারধারে নজর বুলালাম।

'মার্ক কোথায়?'

'ও বাইরে গেছে,' বলে আরও খানিকটা লেমোনেড ঢেলে দিল চাচী।

'বাইরে? কোথায়?'

'রবিন এসেছিল তোদেরকে ডাকতে। ওর বাবা নতুন এক নেচার ভিডিও এনেছেন সেটা দেখাতে। তুই তখন হোমওয়র্ক করছিলি, তাই মার্ক একাই গেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবে।

'কিশোর, কোথায় যাচ্ছিস?' চাচা আমাকে দরজার দিকে পা বাড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করল।

'ভিডিওটা দেখতে চাই আমি,' বলে বেরিয়ে এলাম।

দ্রুত হাঁটছি।

একটু পরে, রবিনের বাসার সামনে চলে এলাম। পড়ন্ত বিকেল, রবিনের বাবা-মা সামনের লনে গার্ডেনিং করছিলেন।

'হাই, আঙ্কল, আণ্টি,' চেঁচিয়ে বললাম।

'আরে, কিশোর যে,' বললেন মিসেস মিলফোর্ড। 'তোমার বন্ধুরা পিছনে আছে, মার্কের আনা কী একটা খেলা খেলছে।'

খেলা? মার্কের আনা? সেটা আবার কী? বললাম মনে মনে।

'মার্ক ছেলেটা সত্যিই ভাল,' বললেন মি. মিলফোর্ড। 'আর নাকি খুব ভাল ফুটবল খেলে।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালাম। এবার বাড়ির পিছনের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

'আমার পালা! আমার পালা!' একটি মেয়ে কণ্ঠ শুনতে পেলাম। পিছনে এসে দেখি রবিন, মুসা, জুলি আর শিনা। সঙ্গে মার্কও রয়েছে।

জুলি চেঁচিয়ে উঠেছিল। মার্ক ওর হাতে একটা বাঁকা জিনিস তুলে দিচ্ছে। বুমেরাং। ছুঁড়ে দিলে আবার ফিরে আসে নিক্ষেপকারীর কাছে।

জুলি ছুঁড়ে দিল ওটা। একটু পরে, হাত বাড়িয়ে লুফে নিল।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

'আগে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। এখন এটা স্রেফ একটা খেলা। এইমিং আর দূরত্ব বিচার করতে কাজে দেয় জিনিসটা,' জানাল মার্ক।

'সবাই ট্রাই করেছে, শুধু কিশোর বাদে,' বলল শিনা। 'বুমেরাংটা কিশোরকে দাও।'

জুলি আমার হাতে দিল জিনিসটা।

বাড়ির বাঁ দিকের এক কোনায় সরে এলাম। এখান থেকে বুমেরাংটা ছুঁড়ে দিলে সোজা আমার কাছেই ফিরে আসবে।

আমার হাত থেকে উড়ে গেল ওটা।

'ফিরে আসবে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না,' বলল মুসা।

আমরা সবাই চেয়ে রয়েছি যেদিকে ছুঁড়েছিলাম। কেউ টুঁ শব্দটি করছে না।

'কী হলো?' প্রশ্ন করল রবিন। আমার দিকে চাইল।

হঠাৎই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওর।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল ও। পরমুহূর্তে ডাইভ দিয়ে আমাকে পেড়ে ফেলল। দু'জনে ছিটকে পড়লাম মাটিতে।

আট

চিতিয়ে পড়েছি আমি।

'কী, ব্যাপারটা কী?' চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ওই দেখো, তোমার পিছনে!' তর্জনী তাক করে বলল রবিন। পিছু ফিরে চাইলাম। বুমেরাংটা উড়ে এসে আমার পিছনে মাটিতে পড়েছে। মাত্র ক'ফিট দূরে।

যেদিকে ছুঁড়েছিলাম তার উল্টো দিক থেকে এসেছে ওটা!

উঠে দাঁড়ালাম। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলাম জিনিসটা।

'খাইছে, এটা কী হলো? ছুঁড়লে একদিকে, এল আরেক দিক থেকে!' বলে উঠল মুসা।

'রবিন আমাকে সময় মত পেড়ে না ফেললে সোজা আমার মাথার পিছনে এসে লাগত,' বললাম।

'সরি, মেট,' বলে বুমেরাংটা আমার হাত থেকে নিল মার্ক, প্যান্টে মুছল। 'এটার এভাবে কাজ করার কথা নয়। তোমার দিনটাই খারাপ।'

'আজকের দিনটা আমার শেষ দিন হতে পারত। আমি মারা যেতে পারতাম।'

'তা হলে আজকের দিনটা তোমার জন্যে শুভ। এতগুলো খারাপ ঘটনা ঘটল, অথচ তোমার কিছুই হলো না,' মৃদু হেসে বলল মার্ক।

এরপর আর খেলা চলে না। আমরা ভিতরে গেলাম ভিডিও দেখতে। আলাস্কার বনভূমি রক্ষার উপর এক ডকুমেন্টারি। কোডিয়াক ভালুক, ঈগল, পর্বতমালা এসব নিয়ে তোলা ছবি, আমার যেগুলো ভাল লাগে।

আমার মাথার মধ্যে অবশ্য ঘুরপাক খাচ্ছে দুর্ঘটনাগুলোর কথা। ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ঘটনাগুলো। আমি নিজেকে মোটেই ভাগ্যবান ভাবতে পারছি না।

ভিডিও দেখা হয়ে গেলে আমি আর মার্ক বাড়ির পথ ধরলাম।

'মার্ক, ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে,' ওর দিকে চেয়ে বললাম,

'কিন্তু যতবারই দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে তুমি আশপাশে ছিলে, প্রতিবারই।'

মার্ক শ্রাগ করে মুচকি হাসল।

'এভাবে ভাবো না কেন, মেট, আমাদের সবার জীবনেই দুর্ঘটনা ঘটে, তোমার বেলায় সবগুলো হয়তো একদিনেই ঘটে শেষ হয়ে গেছে।'

'হতে পারে।' বললাম বটে, তবে আত্মবিশ্বাসী হতে পারলাম না।

বাড়ি ফিরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপরে চলে এলাম। মার্ক চাচা-চাচীর সঙ্গে টিভি দেখতে বসল। দরজাটা স্বাভাবিকভাবেই খুলল এবং এয়ার কণ্ডিশনারটাকে নীরবে জানালায় বসে থাকতে দেখে স্বস্তি বোধ করলাম।

দরজা বন্ধ করে ডেস্কে বসলাম। বইটা খুলে পড়তে লাগলাম। মাঝে মধ্যে নোট নিচ্ছি।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর কাজটা শেষ হলো। হাই উঠছে। ঘুমানোর সময় হলো। পায়জামা পরে হলওয়েতে বেরিয়ে এলাম।

অন্ধকার। চাচা-চাচীর বেডরুমের পাশ কাটালাম। দরজা বন্ধ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। তারমানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বাললাম। তারপর পানির দুটো ফসেটই অন করলাম। এবার সতর্ক আমি। পরখ করে দেখলাম। ঠিকমতই কাজ করছে।

একটু পরে, দাঁত ব্রাশ করতে শুরু করলাম। আয়নায় চোখ পড়তেই বুঝলাম মুখের চেহারায় সারাদিনের দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে।

ব্রাশ করা হয়ে গেলে বাথরুমের বাতি অফ করে দিলাম। হাঁটা দিলাম আমার কামরার উদ্দেশে। হঠাৎই থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো একটা শব্দ শুনেছি। নীচে থেকে আসছে। নিচু, চাপা এক শব্দ। এবাড়িতে এরকম আওয়াজ আগে কখনও পাইনি।

সাবধানে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চাইলাম। চাচা-চাচীর ঘর আবারও পার হয়ে এলাম। এখনও নিস্তব্ধ।

সিঁড়ি ভেঙে ধীরেসুস্থে নামতে লাগলাম। মেইন ফ্লোরে এসে দাঁড়িয়েছি। শব্দটা জোরাল হয়েছে, নীচ থেকে আসছে। মার্ক যে তলায় থাকে সেখান থেকে!

ওর ঘরের উদ্দেশে নেমে যাচ্ছি। ডানদিকে, সিঁড়ির গোড়ায় বন্ধ দরজাটা দেখতে পাচ্ছি। তলা দিয়ে আলো চুইয়ে বেরোচ্ছে। মার্ক জেগে আছে এখনও। কথা বলছে কারও সঙ্গে। কেননা দু'জনের গলা শুনতে পাচ্ছি!

পা টিপে টিপে নেমে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় কান পাতলাম।

'তুমি ঠিকমতই কাজ করছ,' চাপা এক কণ্ঠস্বর বলল। 'কিন্তু আজকে মাত্র প্রথম দিন। আমার আরও অনেক বড় প্ল্যান আছে।'

'না!' মার্ক জবাবে বলল। 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই না!'

'আমি যা বলব তুমি তাই করবে,' হিসিয়ে উঠল অপর কণ্ঠটা। 'আমি তোমার বস, তুমি আমার বশ।'

'না, আমাকে আমার মত থাকতে দিন, প্লিজ!'

'সময় আসুক তোমাকে ছেড়ে দেব। শীঘ্রি। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তোমার দেহ, তোমার আত্মা সব আমার।' হেসে উঠল অচেনা কণ্ঠটা।

'না, আমি আপনাকে চান্স দেব না!'

'তুমি নিরুপায়,' বলল কণ্ঠটা।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল মার্ক। মনে হলো সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে ও। ডোরনবে হাত রেখে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

নয়

মার্ক বিছানায় শুয়ে ছিল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো ধোঁয়ার এক কুণ্ডলী দেখলাম, ওর ঠিক মাথার কাছে। কিন্তু চোখের পলকে মিলিয়ে গেল ওটা। মনে হলো মিশে গেল মার্কের শরীরের ভিতরে!

আমি কোন কথা বললাম না। বদলী ছাত্রটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আমি ঘরে ঢুকেছি টের পায়নি ও। চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে।

'মার্ক,' ফিসফিস করে ডাকলাম। 'তুমি ঠিক আছ?'

জবাব নেই। আরেকটু কাছিয়ে গেলাম। একচুল নড়েনি মার্ক। আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে যেন জানেই না ও। চোখজোড়া বিস্ফারিত!

'মার্ক, তুমি ঠিক আছ?' পুনরাবৃত্তি করে, হাত নামিয়ে ওর বাহু স্পর্শ করলাম।

'কী ব্যাপার!' বলে তড়াক করে সিধে হয়ে বসল ও। এতটাই চমকে গেছি, কয়েক পা পিছু হটে গেলাম।

'মার্ক, আমি কিশোর। এই রুম থেকে কথাবার্তার শব্দ পেলাম। মনে হলো কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে।'

চোখ পিটপিট করল মার্ক। উপলব্ধি করলাম আমাকে দেখার পর এই প্রথম চোখের পাতা ফেলল ও। হঠাৎই ঢিল হয়ে এল শরীর। আবারও স্বাভাবিক দেখাতে লাগল ওকে।

'না, কোন গণ্ডগোল হয়নি, মেট,' মুচকি হেসে বলল, 'বিছানা থেকে দোল খাইয়ে নামিয়ে আনল পা জোড়া। মনে হয় কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'মার্ক, এঘরে তর্কাতর্কি চলছিল।'

ত্বরিত হেসে উঠল ও।

'মনে হয় আবারও ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলাম। বাবা-মা বলে মাঝেমাঝেই নাকি বলি।'

'ঘুমের মধ্যে কথা? দুঃস্বপ্ন দেখেছ নাকি?'

'মনে পড়ছে না।' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল মার্ক। 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।' হাই তুলল। 'ঘুমানো দরকার,' বলল।

আর কথা বাড়ানোর সুযোগ নেই, তাই ওর কামরা ছাড়লাম। তবে এখনও আতঙ্কিত আমি। ওরকম গলা আগে কখনও শুনিনি। মানুষের গলা বলে মনে হয়নি।

কুয়াশার এক কুণ্ডলীকেও মার্কের মুখের চারপাশে ঘুরপাক খেতে দেখেছি। মার্কের বিমান ল্যাণ্ড করার সময়ও আমিই একমাত্র কুয়াশা দেখতে পেয়েছিলাম। হয়তো এসবই আমার কল্পনা!

কিন্তু মার্ক আসার পর থেকে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো তো কাল্পনিক নয়। এখনকার ঘটনাটাও যোগ হলো সেগুলোর সঙ্গে।

মার্ক কথা বলছিল। ঘুমের মধ্যে নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আরও কেউ একজন কিংবা কিছু একটা ওর সঙ্গে কামরায় ছিল। কে কিংবা কী সেটা না জানা অবধি সাবধান থাকতে হবে আমাকে। নিজের স্বার্থেই।

পরদিন নাস্তার টেবিলে সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক মনে হলো। অন্তত উপর-উপর।

'আজকে শুক্রবার,' চাচী বলল। 'মার্ক, এই উইকএণ্ডে তুমি কি বিশেষ কিছু করতে বা দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ, দেশে আমি অনেক হাইকিং করি। রকি বীচের আশপাশে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে। বেড়াতে গেলে মন্দ হত না,' জানাল মার্ক।

'ভাল তো। কিশোর, এই উইকএণ্ডে মার্ককে নিয়ে হাইকিং করে আয় না,' চাচী বলল।

'গ্রেট আইডিয়া,' চাচা যোগ করল। 'আমাদের কাছে তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক সবই আছে।'

'চাচা, তুমি যাবে না?' প্রশ্ন করলাম।

'না, কাজ আছে। প্লাম্বার আর ইলেকট্রিশিয়ান আসবে পাইপ আর তার পরীক্ষা করতে।'

'ক্যাম্পিঙে গেলে মার্কের ভাল লাগবে। আশপাশে দেখার অনেক জায়গা আছে। তা ছাড়া কিশোর আর তুমি একে অন্যকে আরও ভালভাবে চিনতেও পারবে,' উৎসাহ জুগিয়ে বলল চাচী।

মার্কের সঙ্গে ক্যাম্পিঙে যেতে মন সায় দিচ্ছে না আমার। কিন্তু যেতে চাই না বলি কী করে? কী বলব? মার্ক ছেলেটা অদ্ভুত? এই দুর্ঘটনাগুলো ও-ই ঘটাচ্ছে? আমাকে লক্ষ্য করে এগুলো ঘটানো হচ্ছে? নাহ, কেউ বিশ্বাস করবে না।

'কিশোর, তুই কিছু বলছিস না যে?' চাচী জিজ্ঞেস করল। সবাই আমার দিকে চেয়ে।

কথা দিলাম উইকএণ্ডে মার্ককে নিয়ে ক্যাম্পিঙে যাব। খুব মজা হবে। সিরিয়ালের বাইরের দিকে চোখ নামিয়ে মিথ্যে কথাটা বলতে হলো আমাকে।

ব্রেকফাস্ট সেরে স্কুলের উদ্দেশে রওনা হলাম আমরা।

আমরা স্কুলে ঢুকতেই, কয়েকটা ছেলে-মেয়ে আমাদের দিকে ঘুরে চাইল।

'অ্যাই, মার্ক, কেমন আছ?' মুসা চেঁচিয়ে উঠল।

'শার্টটা দারুণ, মার্ক,' মৃদু হেসে বলল রবিন।

'মার্ক, কাল রাতে বুমেরাং নিয়ে হেভি মজা হয়েছে,' বলল শিনা।

মার্ক সবার মনোযোগ পাচ্ছে। নতুনরা পেয়েই থাকে। এতে আমার মন খারাপের কিছু নেই। আমি যদি অস্ট্রেলিয়া যাই, আমাকে নিয়েও মার্কের বন্ধুদের মধ্যে মাতামাতি হবে।

বেল বাজলে যে যার সিটে বসলাম। মিসেস রবার্টস রোলকল করে সোজা আমার দিকে চাইলেন

'কিশোর, তোমার বুক রিপোর্ট হয়েছে?' করলেন।

'জি, মিসেস রবার্টস,' জবাব দিলাম।

যার যেদিন বুক রিপোর্ট, তাকে সেদিন ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত বই সম্পর্কে বলে যেতে হয়।

ক্লাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সবার দৃষ্টি আমার দিকে।

মিসেস রবার্টস ডেস্কে বসে টেপ রেকর্ডার করলেন। উনি সব সময় আমাদের রিপোর্ট রেকর্ড করেন, পরে যা আমরা স্টাডি করতে পারি।

'কিশোর আমাদেরকে আমেরিকান বিপ্লবের পর পড়া বইটা সম্পর্কে রিপোর্ট করবে,' বললেন মিসেস রবার্টস।

গলা খাঁকরে নিলাম। হঠাৎই মাথাটা ঘুরে উঠল বোঁ করে। ঘরটা বনবন করে ঘুরছে। টলতে লাগলাম।

'কিশোর, কিশোর, তুমি ঠিক আছ তো?' বলে এগিয়ে এলেন মিসেস রবার্টস। গোটা ঘরটা নাচছে আমার চোখের সামনে। মার্কের নীল চোখে চোখ পড়ল আমার। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। পরমুহূর্তে চারদিক আঁধার হয়ে গেল।

দশ

চোখ খুললাম। সব কিছু অস্পষ্ট লাগছে। চোখ পিটপিট করলাম।

'কিশোর, এখন কেমন লাগছে?' মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

কাউচে শুয়ে আমি। কামরার চারদিকে নজর বুলালাম। স্কুল নার্স, মিসেস ডনেলি আমার উদ্দেশে স্মিত হাসলেন। তাঁর পাশে বসে ডক্টর রিচার্ডসন, চোখের ডাক্তার।

উঠে বসলাম। আমি এখানে এলাম কীভাবে? ক্লাসে কথা বলতে যাচ্ছিলাম এটুকু মনে আছে।

'কিশোর, এখন কেমন আছ বলো। আমার সাথে কথা বলো,' বললেন মিসেস ডনেলি।

চোখ ঘষে ওঁর দিকে চাইলাম।

'ভাল আছি।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসি বিনিময় করলেন ওঁরা।

'গুড। তুমি এখন ঠিক হয়ে গেছ। ডক্টর রিচার্ডসন তোমাকে একটু পরীক্ষা করে দেখবেন।'

'কেন?'

'তেমন কিছু না। তোমার চোখ দুটোকে খানিকটা আউট অভ ফোকাস মনে হলো, তাই।' বললেন ডাক্তার।

পেন্সিল লাইট দিয়ে আমার চোখ পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন।

'কোন সমস্যা নেই,' বলে লাইট নিভালেন। 'একদম ঠিক আছ তুমি।' দরজার দিকে পা বাড়ালেন। 'কোন সমস্যা হলে আমাকে জানিয়ো।'

'ঠিক আছে, ডক্টর রিচার্ডসন। একটা প্রশ্ন করতে পারি?' জবাব চাইলাম।

'নিশ্চয়ই।'

'লাইট সেনসিটিভিটি নামে কোন চোখের অসুখ আছে? যেজন্যে কণ্ট্যাক্ট লেন্স পরতে হয়?'

আমার দিকে চাইলেন ডক্টর রিচার্ডসন।

'খুবই বিরল এই রোগ। এসব ক্ষেত্রে আমরা স্পেশাল আই-ড্রপ দিই। কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। এতে চোখের কষ্ট আরও বাড়বে। কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?'

'একজনের কাছে শুনেছিলাম কিনা তাই,' আসল কথা চেপে গেলাম। 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

তারমানে মার্ক তার চোখের রং পরিবর্তন বিষয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। ওর বাদামী চোখ হালকা নীল হলো কীভাবে?

ড. রিচার্ডসন চলে গেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'আমি বরং ক্লাসে ফিরে যাই,' বললাম মিসেস ডনেলিকে।

'কিশোর, ক্লাসে তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, তার আগে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে,' বললেন মিসেস ডনেলি।

'অদ্ভুত?' মনে করার চেষ্টা করলাম।

'মিসেস রবার্টস এটা টেপ করেছেন শোনো।'

টেপ রেকর্ডারের বাটন টিপলেন তিনি। নিজের গলা শুনতে পেলাম। উদ্ভট সব কথা বলে চলেছি।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলেন মিসেস ডনেলি।

'কিশোর, তুমি ক্লাসে কথা বলছিলে।'

'মনে পড়েছে।'

'তোমার কী হয়েছিল বলো তো? অপ্রাসঙ্গিক কথা-বার্তা বলছিলে কেন? আমরা তো ভেবেছিলাম হাসপাতালে নিতে হবে তোমাকে।'

'তার দরকার নেই। আমি এখন ভাল আছি।' কী হয়েছিল? আমার ধারণা এর সঙ্গে মার্ক জড়িত। আমি মরিয়ার মত আমার সন্দেহের কথা কাউকে বলতে চাইছি, কিন্তু কাকে বলব? কেউ তো বিশ্বাস করবে না।

কাজেই মিসেস ডনেলিকে বললাম, কাল অনেক রাত অবধি কাজ করেছি বলে ক্লাসে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি, আবোল তাবোল বকতে থাকি।

ক্লাসরুমে ফিরে এলাম আমি। মুসা আর রবিন দৌড়ে এল আমার

কাছে।

'এখন কেমন লাগছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল রবিন।

'খাইছে! যে ভয় পেয়েছিলাম!' বলল মুসা।

আমি ভাল আছি, আশ্বস্ত করলাম ওদেরকে।

মিসেস রবার্টস আমাকে তাঁর ডেস্কে ডেকে নিলেন।

'তোমার রিপোর্ট আগামী সপ্তায় দিলেও চলবে। এখন চুপচাপ বসে থাকো। কোন টেনশন কোরো না।'

টেনশন করব না! না করে উপায় আছে? মার্ক, কিংবা তাকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে সে ক্রমেই পেয়ে বসছে আমাকে। আমার জীবনটা নরক বানিয়ে ছাড়ছে। ভাগ্যগুণে কিংবা মনের জোরে এখন পর্যন্ত অশুভ শক্তির হাত এড়াতে পেরেছি আমি। কিন্তু এভাবে কতদিন?

বাকি সময়টুকুতে অস্বাভাবিক আর কিছু ঘটল না। স্কুলের ঘণ্টা বাজলে বেরিয়ে এলাম আমরা। আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার।

'ক্যাম্পিঙের জন্যে আদর্শ ওয়েদার,' বলল মার্ক।

আমি চুপ করে রইলাম। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে খুশি হতাম। ওর সঙ্গে ক্যাম্পিঙে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না আমার।

'সোমবার দেখা হবে!' বলল মুসা। ও আর ডুগি যার যার বাইসাইকেলে চাপল।

'মুসা, তোমার সাইকেলটা একটু দেবে? দেশে আমি অনেক সাইকেল চালাই,' সোৎসাহে বলে উঠল মার্ক।

'নিশ্চয়ই,' বলে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে ওটা টেনে এগিয়ে দিল মুসা। মার্ক এক লাফে চড়ে বসল সিটে।

'দারুণ,' বলে ছোট চক্র কেটে ঘুরতে লাগল। হঠাৎই চোখ পড়ল আমার দিকে। ঝিকিয়ে উঠল ওর নীল চোখজোড়া। 'কিশোর, ডুগিরটায় তুমি চাপো। চলো, এক পাক ঘুরে আসি। ঢিবি পর্যন্ত রেস দিয়ে যাব আবার ফিরে আসব।'

'স্কুলের মাঠে রেস দেয়া ঠিক হবে না,' বললাম।

'স্রেফ ঢিবি পর্যন্ত। আজকে শুক্রবার, কেউ কিছু মনে করবে না।'

'করতেও পারে।'

'কী, কিশোর, মার্কের সঙ্গে রেস দিতে ডরাচ্ছ নাকি?' ডুগি বলল।

এসময় রবিন, ডুগি আর কয়েকটা ছেলে-মেয়ে ওখানে এসে হাজির হলো।

'কী হয়েছে?' রবিন প্রশ্ন করল।

'মার্কের চ্যালেঞ্জ নিতে ভয় পাচ্ছে কিশোর,' ডুগি জানাল।

'মোটেই না,' দৃঢ় গলায় জানালাম। 'ডুগি, তোমার সাইকেলটা দাও।' সাইকেলে চেপে ছোট করে দু'চারপাক দিলাম। অভ্যস্ত হয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকালাম মার্কের উদ্দেশে। 'আমি তৈরি। কেউ একজন কাউন্ট ডাউন করো।'

'আমি করছি,' বলল মুসা। 'বাইকাররা, যার যার জায়গা নাও।'

পাশাপাশি সাইকেল নিয়ে দাঁড়ালাম মার্ক আর আমি। আমাদের ঠিক সামনে, একশো গজ দূরে ঢিবি। আমরা সাইকেল রেস দিয়ে ওখানে যাব, ঘুরব এবং ফিরে আসব শুরুর জায়গায়। যে আগে আসবে সে বিজয়ী।

'অন ইয়োর মার্ক। গেট-সেট,' বলল মুসা । বিরতি নিল। সবাই নীরব। মার্ক আমার দিকে চকিত চাউনি হানল। মনে হলো ওর চোখে মুহূর্তের জন্য কুয়াশা দেখলাম। 'যাও!'

সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। ছিটকে বেরিয়ে গেলাম মার্ক আর আমি। পাশাপাশি ছুটে চলেছে দুটো সাইকেল। প্রথমে সামান্য এগিয়ে গেলাম আমি, তারপর মার্ক, তারপর আবার আমি। এবার মার্ক নাগাল ধরে ফেলল।

ঢিবির দিকে উড়ে চলেছি যেন আমরা। রেসের জয়-পরাজয় এখুনি নির্ধারিত হয়ে যাবে। যথাসময়ে ব্রেক করে, ঘুরে যে ফিনিশ লাইনে আগে ফিরে আসতে পারবে তারই জিত হবে।

প্রতিযোগিতা নিয়ে এতটাই মগ্ন ছিলাম, অন্য কিছুই মাথাতে ঠাঁই পায়নি। একটু পরেই অনুভব করলাম সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই ঘটছে। বাইকটা মসৃণ গতিতে চলেছে, উল্টোপাল্টা কোন ব্যাপার নেই।

ঢিবিটা আর মাত্র পনেরো গজ দূরে। মার্ক ঠিক আমার পাশে টার্নিং পয়েন্টে। একসঙ্গে পৌঁছলাম আমরা, মার্ক ঘুরে চাইল আমার দিকে, দীপ্তি ছড়াল ওর চোখজোড়া।

চোখ সরিয়ে নিলাম আমি, ঘোরার জন্য ব্রেক চাপলাম। কিন্তু যতবারই ব্রেক চাপছি, বাইক ততই আরও জোরে ছুটছে! ঢিবিটা ঠিক আমার সামনে। থামতে পারছি না আমি। প্রচণ্ড গতিতে খাড়া ঢিবি থেকে তালগোল পাকিয়ে পড়ে যেতে চলেছি আমি!

এগারো

আগে কখনও এই ঢিবির ঢাল বেয়ে নামিনি। কেউ নামেনি। কাজটা অবৈধ, যেহেতু বিপজ্জনক। ঢিবির চূড়া থেকে যখন উড়ে গেল বাইকটা, আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম। ঘাবড়ালে চলবে না।

ব্রেক আর কষলাম না। বাইকটা ঊর্ধ্ব গতিতে ছুটে চলেছে এখনও। আর ধরে থাকতে পারছি না। মনটাও বাইকের গতিতে রেস দিচ্ছে। তলপেট ফাঁকা। বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগছে মুখে। ঢিবির পাদদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে! এবার মাথায় একটা চিন্তা ঘাই মারল। ব্রেক চাপলে যদি বাইক আরও জোরে ছোটে, তা হলে হয়তো উল্টোটাও সত্যি।

পেডালে দু'পা রেখে বনবন করে ঘুরাতে লাগলাম।

হ্যাঁ, সহসাই ধীর হয়ে এল বাইকের গতি!

ঢাল বেয়ে তখনও নেমে চলেছে বাইকটা, কাজেই নীচে নামা না পর্যন্ত পুরোপুরি থামবে না। তবে গতিটা আমি কমাতে পেরেছি। মিনিট খানেকের মধ্যে ঢিবির নীচে নেমে এসে নিরাপদে থেমে দাঁড়াতে পারলাম।

ঢিবির চূড়ার দিকে চোখ তুলে চাইলাম। ঢোক গিললাম। সবাই দাঁড়িয়ে ঢিবির মাথায়। আমার দিকে চেয়ে তলার উদ্দেশে আঙুল নির্দেশ করছে। হয়তো আমার দুঃসাহসের কথা বলাবলি করছে।

বাইকটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ঢিবি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

'কিশোর, কী হয়েছিল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'আমরা তো ভেবেছিলাম মারাই যাবে বুঝি। নীচে নামতে গেলে কেন?'

'কোথায় থামতে হবে বুঝতে পারিনি,' বলে মার্কের দিকে চাইলাম। 'তুমি জিতে গেছ, মার্ক।'

'তুমি বিপদকে জয় করেছ। তুমিই বিজয়ী, মেট,' বলল মার্ক। 'পরীক্ষায় উতরে গেছ তুমি।'

কীসের পরীক্ষা? কার কাছে পরীক্ষা? যে বা যা কাল রাতে মার্কের সঙ্গে কথা বলছিল তার কাছে? এই পরীক্ষার পিছনে কি কোন ধরনের পরিকল্পনা ছিল? এর শেষ কখন, কোথায়? মার্ক কি জানত? জানলেও বলবে না। জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ নেই। আমাকে স্রেফ সতর্ক থাকতে হবে পরের পরীক্ষাটার জন্য।

আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে এই উইকএণ্ডে। মার্ক আর আমি যখন ক্যাম্পিঙে যাব।

শনিবার সকালে ক্যাম্পিঙের জিনিসপত্র গোছগাছ করলাম। পাপ টেন্ট পরিষ্কার করলাম, স্লিপিং ব্যাগ টান-টান করে নিলাম, গ্যাস ল্যাম্প আর ফ্ল্যাশলাইট পরখ করলাম, চাচীর দেওয়া খাবার আর বেভারেজ প্যাক করলাম।

দু'জনের পরনেই জিন্স, সোয়েটশার্ট আর ব্যাকপ্যাক, শনিবার বিকেল নাগাদ তৈরি হয়ে গেলাম আমরা ক্যাম্পিঙের জন্য।

'কিশোর, তুই যেহেতু এলাকাটা চিনিস, কাজেই তুই-ই লিডার। এটা নিরাপদ এলাকা। রাতে যখন ক্যাম্প করবি নিরাপদ, শুকনো দেখে একটা জায়গা বেছে নিবি। আর মনে রাখবি ডাকলেই যেন একজন আরেকজনের গলা শুনতে পাস,' চাচা পরামর্শ দিল।

'মনে থাকবে, চাচা,' বললাম।

'তোদের ভাল সময় কাটুক,' চাচী বলল। দু'জনকেই জড়িয়ে ধরল। 'কালকে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবি কিন্তু, মনে থাকে যেন।'

গাড়ি ওনিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

সারাদিন কয়েক ঘণ্টা শহরের পিছনের বনভূমি ভেদ করে এগোলাম।

'আমাদের দেশে এরকম বন নেই,' বলল মার্ক। শেষ বিকেল। বিশ্রাম নিতে থেমেছি আমরা। জঙ্গলের ভিতরে, এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় বসেছি দু'জনে, লেমোনেড পান করছি।

'জানতাম তোমার ভাল লাগবে,' বললাম।

'আমি আসলে খানিকটা হোমসিক হয়ে পড়েছি,' বলল মার্ক। 'যেদিন এলাম সেদিন জলাভূমির উপর দিয়ে এসেছিলাম। ঠিক আমার অস্ট্রেলিয়ার মত লেগেছিল। ওখানে হাইকিং করলে কেমন হয়, মেট? রাতে আমরা যদি ওখানে ক্যাম্প করি?'

জলাভূমি! মার্ক সবচাইতে ভুতুড়ে জায়গাটা বেছে নিয়েছে রাত কাটানোর জন্য।

'জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে,' বললাম।

'তাতে সমস্যা নেই। তাঁবু আর ব্যাগগুলো ওয়াটারপ্রুফ। জায়গাটা একনজর দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।'

ও নীল চোখ মেলে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। ভয় পেয়েছি বোঝানো যাবে না। জানি পালিয়ে লাভ হবে না। শোডাউন যদি জলাভূমিতে হয় তো হোক।

কাজেই রাজি হয়ে গেলাম আমি। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড।

অনেকটা পথ হাইক করে জলাভূমিতে পৌঁছতে হলো। দূর থেকে এয়ারপোর্ট চোখে পড়ছে।

'তুমি ওখানে ল্যাণ্ড করেছিলে,' বললাম।

'হ্যাঁ।' চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। 'আঁধার হয়ে আসছে। এটা রাত কাটানোর জন্যে চমৎকার জায়গা।'

দুটো লম্বা উইলো গাছের মাঝে শুকনো এক স্পট খুঁজে নিলাম আমরা। দূরাগত ব্যাঙের ডাক কানে আসছে। কয়েকটা জোনাকি পোকা উড়ে গেল। এখন গোধূলি, অতটা গা ছমছম করছে না। তবে শীঘ্রিই করবে।

পরের বিশটা মিনিট তাঁবু খাটাতে আর ব্যাগ বিছাতে কেটে গেল। এবার ডিনারের ব্যবস্থা করলাম। ফ্র্যাঙ্কস আর বিনস।

মাটিতে বিছানো এক কম্বলের উপর বসেছি দু'জনে, নিঃশব্দে ডিনার সারছি। ইতোমধ্যে আঁধার ঘনিয়েছে। প্রদীপ জ্বেলেছি আমি।

মার্ক খাওয়ার সময় একদৃষ্টে প্রদীপের আলোর দিকে চেয়ে রইল।

অগ্নিশিখায় স্থির ওর দু'চোখ।

আচমকা আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল ও।

'ঘুমিয়ে পড়িগে যাই,' বলে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি এখন ঘুমাবে নাকি আরও খানিকক্ষণ জেগে থাকবে?'

'আরেকটু জাগি,' বললাম। আসলে প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছি, কিন্তু মার্ক গভীর ঘুমে তলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমাতে চাই না।

মার্ক তাঁবুতে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকল। ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরে।

আমি বাইরে প্রদীপের আলোর নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকলাম। শান্ত, আরামদায়ক পরিবেশ। এখানে কোন বিপদ হবে না, ভাবলাম। ভুল ভেবেছিলাম। এজায়গাটাকে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। বরঞ্চ উল্টো–চমৎকার জায়গা। চোখজোড়া ভারী হয়ে আসছে। শিথিল হয়ে আসছে শরীর।

'কিশোর,' চাপা এক কণ্ঠস্বর কানে এল। 'অ্যাই, কিশোর, চোখ খোলো।'

চোখের পাতা তিরতির করে কেঁপে উঠল। তন্দ্রা কেটে গেছে। কেউ কি ডাকল আমার নাম ধরে?

'মার্ক?' বলে উঠে বললাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম প্রদীপের পাশে বসে।

'মার্ক এখন সচেতন নয়, কিশোর। ও তোমার কথা শুনতে পাবে না। আমি পাব। এবং সেটাই তোমার দরকার।'

চোখ পিটপিট করলাম। কণ্ঠটা পরিচিত। মার্ক ওর কামরায় এর সঙ্গেই তর্কাতর্কি করছিল। চোখ তুলে চাইতেই কুয়াশাচ্ছন্ন, ধোঁয়াটে এক অবয়ব দেখতে পেলাম। সারা শরীর ধূসর, শুধু একটা জিনিস বাদে। একজোড়া অন্তর্ভেদী, ঝিকিমিকি নীল চোখ!

বারো

'পরীক্ষা শেষ, কিশোর। তুমি ভাল করেছ, প্রতিবারই পাস করেছ তুমি। তুমি হবে আমার পারফেক্ট হোস্ট।'

'তারমানে?' কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। 'কে আপনি? কী আপনি?'

'কিশোর, তুমি জান আমি কে। আমি ক্যাপ্টেন স্টার। ওরা আমাকে ল্যাণ্ড করতে দেয়নি, কিশোর। আমার আত্মা এতদিন ধরে সুন্দর একটা ল্যাণ্ডিঙের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেই সুযোগ পেয়ে গেছি আমি। তুমি আমার আত্মাকে তোমার দেহে ধারণ করবে। তুমি হবে আমার হোস্ট,' আবারও বলল ছায়ামূর্তিটা।

তাঁবুর দিকে পিছিয়ে গেলাম। কুয়াশাময় জিনিসটার দিকে চোখ সেঁটে আছে আমার। কিন্তু ক্রমেই সরে যাচ্ছি আমি ইঞ্চি-ইঞ্চি করে।

'আপনি মার্কের শরীরের ভিতরে ছিলেন, তাই না?' প্রশ্ন করলাম। ছায়াময়কে কথা বলিয়ে সময় পেতে চাইছি।

'হ্যাঁ, সেদিন ওর প্লেন যখন কুয়াশার মধ্যে ঢুকল তখন ওর দেহে প্রবেশ করি আমি। ওকে ব্যবহার করে আমি তোমার কাছে আসি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি, তুমি আমার উপযুক্ত মেজবান হতে পারবে কিনা। তুমি প্রতিটা পরীক্ষায় পাস করেছ, কিশোর!' খলখল করে হাসল ওটা। 'তোমাকে দিয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করিয়েছি। তোমার সাথে উল্টোপাল্টা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠাণ্ডা পানির বদলে গরম পানি, এয়ারকণ্ডিশনার থেকে গরম বাতাস বেরনো—এসবের কথা বলছি। তুমি প্রতিটা পরীক্ষায় উতরে গেছ। শেষমেশ পেডাল মেরে বাইক পর্যন্ত থামিয়ে ফেলেছ। হবে, কিশোর, তোমাকে দিয়ে হবে!'

'আপনি আমাকে আপনার আত্মার হোস্ট বানাতে চান কেন?' জিজ্ঞেস করলাম। আমি থমকে দাঁড়িয়েছি ব্যাকপ্যাকের কাছে। ওটা আমার পিছনে। ডান পায়ের পিছনের অংশ ছুঁয়ে আছে ব্যাকপ্যাকটাকে।

'কারণ আমি শেষ পর্যন্ত ল্যাণ্ড করতে চাই, কিশোর। তোমার শরীরে প্রবেশ করে, তোমার মন আর আত্মাকে দখল করে আমি সুযোগটা পেতে চাই! আমি কিশোর পাশা বনে যাব। সবাই যাকে ভালবাসে। আমরা দু'জনে মিলে সবার উপরে প্রতিশোধ নেব। এই শহর বহু বছর আগে আমার সাথে যা করেছে তার প্রতিশোধ!'

ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকাচ্ছি আমি।

'ওরা বহু বছর আগে আপনার সাথে কী করেছিল, ক্যাপ্টেন স্টার?'

জবাব চাইলাম। আমার কণ্ঠস্বর জোরাল শোনালেও শব্দগুলো মুখ থেকে বের করতে কষ্ট হলো–দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে।

'ওরা আমাকে ল্যাণ্ড করতে দেয়নি! আর এই কুয়াশা আমার শরীর দখল করে নেয়। আমাকে বন্দি করে, আকারহীন, অবয়বহীন এক অস্তিত্বে পরিণত করে। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ!' চেঁচিয়ে উঠল ওটা।

মায়াই লাগল ওটার প্রতি। কিন্তু তাই বলে ছায়ামূর্তিটার ধারক হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই আমার। এখন রক্ষা পাওয়ার একটাই মাত্র উপায়। সরাসরি ওটার চোখের দিকে চাইলাম।

'ঠিক আছে, আমি রাজি,' বললাম।

'ধন্যবাদ, কিশোর। দখলের জন্যে প্রস্তুত হও। আমাদের দীর্ঘ প্রতিশোধপরায়ণ জীবন শুরু হোক!'

নীল চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলছে। কুয়াশা পাকিয়ে উঠে সোজা, সরু এক স্তম্ভে রূপ নিয়েছে। আমার দিকে পাক খেয়ে নেমে আসছে এ মুহূর্তে।

কোন ভুল-চুক করা চলবে না।

আমার হাতে এক কি দুই সেকেণ্ড মাত্র সময়।

কুয়াশা চেপে আসছে আমার উপরে। আর মাত্র ক'ফুট বাকি, এখুনি মাথা ছুঁয়ে ফেলবে!

ব্যাকপ্যাক থেকে এক টানে ফ্ল্যাশলাইটটা বের করলাম। পরমুহূর্তে সুইচ টিপে সোজা তাক করে ধরলাম আগুয়ান কুয়াশার কুণ্ডলীটার উদ্দেশে।

'না!' করুণ চিৎকার উঠল। আলোয় ধরা পড়েছে কুয়াশা। আলোর রশ্মি ধরে রেখেছি, ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে লাগল ওটা। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষ অবধি রইল শুধু অল্প একটুখানি ধোঁয়া আর নীলজোড়া তীক্ষ্ণ, নীল চোখ। চোখজোড়া আমার দিকে শেষবারের মত অভিশাপদৃষ্টি হেনে আবছা কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

তেরো

'কী ভেবে ফ্ল্যাশলাইট অন করলে, মেট?' মার্ক জানতে চাইল।

পরদিন সকাল।

জলাভূমি ভেদ করে বাড়ির পথে চলেছি।

'তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার পরপরই তুমি একটা কথা বলেছিলে,' জবাব দিলাম। 'বলেছিলে প্লেন ল্যাণ্ড করার ঠিক আগ মুহূর্তে কেবিনের বাতিগুলো নিভু-নিভু হয়ে আসে। আমার ধারণা সে সময়ই ক্যাপ্টেনের আত্মা তোমার শরীরে প্রবেশ করে। ওটা হয়তো আলো সইতে পারে না, তাই কাজটা আঁধারেই সেরেছে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' স্বস্তির হাসি হেসে বলল মার্ক। ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলাম। কুয়াশা উবে যাওয়ার পরপরই ঘুম ভাঙে মার্কের। ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখেছি আগের স্বাভাবিক বাদামি রং ফিরে পেয়েছে।

'বুড়োর আত্মা আমার শরীরে ঢোকার পর থেকে ভয়ঙ্কর সময় কেটেছে। তোমাকে বলতেও পারি না, সইতেও পারি না–সে এক বিশ্রী অবস্থা,' বলল মার্ক।

'তোমার তো কোন দোষ নেই। তুমি ওর নিরীহ এক শিকার। আর তুমি যদি কেবিনের বাতি নেভার কথা না বলতে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বালার কথা মাথায় আসত না আমার। কাজেই, আমরা দু'জনে একসাথে দুষ্ট আত্মাকে হারিয়েছি। আমরা একটা দল হিসেবে কাজ করেছি।'

পরস্পরের হাত ঝাঁকিয়ে দিলাম আমরা।

'বাসায় ফিরতে কতক্ষণ লাগবে বলতে পারো?' মার্কের প্রশ্ন।

'দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'এখন কটা বাজে?'

রিস্টওয়াচ দেখলাম।

'এগারোটা প্রায়।' ঘড়ির দিকে চেয়ে রয়েছি। হঠাৎই হাঁটার গতি ধীর

হয়ে এল।

'কী হলো?'

জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে। বড় কাঁটাটা বারোটার ঘরের উদ্দেশে এগোচ্ছে। ছোট কাঁটাটা এগারোর ঘরে।

আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সেকেণ্ডের কাঁটা। পিছন দিকে চলেছে ওটা।

ঠিক সে মুহূর্তে, মনে হলো আকাশে পুরানো এক বিমানের এঞ্জিনের শব্দ শুনলাম। মুখ তুলে চাইলাম। কিচ্ছু নেই। স্রেফ স্বচ্ছ নীল আকাশ।

***